প্রাচীন প্রবন্ধ।

প্রথম ভাগ।

শ্রীকেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

CALCUTTA.
S. K. Lahiri & Co.
54, College Street.
1894.

কলিকাতা,
ভবানীপুর, পার্থিব-যন্ত্রে মুদ্রিত।

 [মূল্য।৶৹ ছয় আনা মাত্র।

ভূমিকা।

এই পুস্তকে, বৈদিক সময় অবলম্বন করিয়া, কতিপয় প্রবন্ধ লিখিত হইল। প্রাচীনকালের কথা সাধারণতঃই উপাদেয়,—হিন্দুবালকের পক্ষে, বৈদিক সময়ের বৃত্তান্ত যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে, একাধিক কারণে তাহার আশা করা যায়। ইহা, স্বভাবসিদ্ধ ভক্তির সহিত, পঠিত হইবে। ইহাতে, জাতীয় রীতি নীতি, সাধুতা ও সৎকর্ম্মনিষ্ঠার আলোচনা হইবে। পূর্ব্বপুরুষদিগের মহত্ত্ব ও অগ্রবর্ত্তিতা অবগত হইয়া, বালকের মনে বিমল আনন্দ ও পবিত্র গৌরবের উদয় হইবে, এবং যদি আমার ভ্রম না হয়, আর্য্যবংশধর, আপন মর্য্যাদা বুঝিয়া, চরিত্রগঠনের প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইবেন।

পুস্তক-খানি যাহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী হয়, তদ্বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই, কিন্তু মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের হস্তে, ইহা কতদূর সুসম্পন্ন হইয়াছে, বলিতে পারিনা। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া প্রাচীন প্রবন্ধকে বালকদিগের পাঠোপযোগী মনে করিলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, এই গ্রন্থপ্রণয়ন সম্বন্ধে, বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী নানাশাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি এস্, সি আই ই, মহোদয় কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ হইতে, আমি অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মহাত্মার প্রসাদাৎ না হইলে, কেবল সায়ণাচার্য্যের টীকাবলম্বনে, এই কার্য্য কত কালে সম্পাদিত হইত, বলিতে পারি না।

ভবানীপুর
২২শে ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মণঃ।

উৎসর্গ-পত্রং।

নানাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী

এম, এ, বি, এল্ মহোদয়-করকমলেষু।

মহাত্মন্

যদ্ জ্ঞানং তব বাক্যেন চিত্রালাপেন লভ্যতে।
নহি গ্রন্থশতেনাপি তদ্ জ্ঞানমধিগম্যতে॥
প্রত্নতত্ত্ববিদা পূর্ব্বং যত্ত্বয়া কথিতং ময়ি।
সংবৃতস্তেন সর্ব্বেণ গ্রন্থোঽয়ং রচিতো ময়া॥
ঋগ্বেদার্ণব-রত্নসংগ্রহপরঃ কশ্চিদ্‌বুধো যদ্যপি।
বালানাম্ কমকণ্ঠধারণহিতাং মালাং চিকীর্ষুর্ভবেৎ॥
তেন স্যাদতিশোভনং ফলমিতিপ্রীতির্মমাত্যন্তিকী।
নৈব স্যাদ্বহুগোচরা তনুমতের্মূর্খস্য মে ধৃষ্টতা॥
সমীপগন্তুং ভবতস্তথাপি।
প্রকৃষ্টহর্ষঃ খলু জায়তে মে॥
উৎসর্গহেতোরপি কল্পিতং যৎ।
গুণেন সম্যগ্‌বিহিতং ন বা স্যাৎ॥
নিবেদয়ন্নেতমতিপ্রযত্নৈ।
গ্রন্থং ভবদ্ভ্যো নিয়তং ন লজ্জে॥
পশ্যন্তি চেতো হি ধনং ন দাতু।
র্ভবাদৃশা যদ্বিনয়ানতস্য॥

শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মণঃ।

সূচি।

প্রাচীন প্রবন্ধ।

প্রথম ভাগ।

সরস্বতী।

পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় এক সময়ে সরস্বতী আর্য্য-জাতির পরমারাধ্য তটিনী ছিলেন।

সরস্বতী পশ্চিম হিমালয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মসর দিয়া কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে প্রস্থিত হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়েন।

সরস্বতী সামান্য বেগবতী নদী ছিলেন না। বর্ষার প্রারম্ভে প্রবল স্রোতোবেগে তদীয় পার্ব্বতীয় তীর প্রদেশ ও ভগ্ন হইত, কুত্রাপি উভয় কূল নাশ প্রাপ্ত হইত; কখনও বা অপরিমিত জলোচ্ছ্বাসে সমীপবর্ত্তী ভূখণ্ড সকল প্লাবিত হইয়া যাইত।

কিন্তু এই সমস্ত নদীজাতির দোষ না হইয়া বরং উৎকৃষ্ট নৈসর্গিক গুণের মধ্যেই পরিগণিত। স্রোতোবেগে কূল ভগ্ন হইলে, তীর ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, এবং অধিবাসীরা বহুল ধন ধান্য ভোগ করিয়া থাকে। জলের উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইলে তীর প্রদেশ পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যের আবাসভূমি হয়।

প্রায় চারি সহস্র বৎসর অতীত হইল, আর্য্যগণ তাদৃশ মহতী নদীর তীরে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক ভূখণ্ডে বাস করিতেন। সরস্বতীর পবিত্রসলিলবিধৌত উর্ব্বরা ভূমিতে কৃষি ও পশুচারণই তাঁহাদের প্রধান জীবনোপায় ছিল। তদীয় বারিসিক্ত সুজাত নবদূর্ব্বাদলে তাঁহাদের পশুপাল বৃদ্ধি পাইত, এবং অল্পায়াসজাত শ্যামল শস্যরাজিতে তাঁহাদের জাতীয় সমৃদ্ধি সংস্থাপিত হইত।

ফলতঃ জাতীয় উন্নতির মূলে সর্ব্বত্রই অন্নের সুলভতা দৃষ্ট হয়। যে স্থানে যত সুলভে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়াছে, সেই স্থানেই মনুষ্যেরা তত শীঘ্র সভ্যতা পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন। কেননা অল্পায়াসে মূলধন সঞ্চিত হইলে, মনুষ্যদিগকে জীবিকার জন্য আর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না, সহজেই তাঁহাদের মানসিক শ্রমপ্রবৃত্তি জন্মে, এবং তাহা হইতেই নানাবিধ বিদ্যার সূত্রপাত হইতে থাকে।

মহতী সরস্বতীই যে আর্য্যদিগের এই সমস্তের নিদান, প্রাচীন মহর্ষিরা তাহা সম্যক্ অনুভব করিয়াছিলেন। অগ্নি প্রভৃতি দেবতার ন্যায় সরস্বতীর উপাসনার্থে কতিপয় ঋক্ ও প্রস্তুত হইয়াছিল।

"পবিত্র অন্নময়ী সরস্বতীকে আমরা যজ্ঞে অন্ন প্রদান করিতেছি, তিনি আমাদের অন্নময় যজ্ঞ কামনা করুন, তিনি আমাদিগকে ধনদান করুন।

"সরস্বতী সত্য এবং মনোহর বাক্য দান করেন, তাঁহার প্রসাদে সুমতি লোকেরা শিক্ষা লাভ করে।

"সরস্বতী প্রবাহিত হইয়া প্রভূত জল দান করেন, এবং তাঁহার দ্বারাই সকল প্রকার জ্ঞান উদ্দীপিত হয়।"

অনন্তর পৌরাণিক সময়ে যখন আর্য্যেরা ভারতের সীমা হইতে সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেন, জাহ্নবী প্রভৃতি পুণ্য তটিনীগণ অভ্যাগত মহাত্মাদিগকে অশেষ ধন ধান্যে বিভূষিত করিলেন, তখনও তাঁহারা শৈশবপালয়িত্রী সরস্বতীকে বিস্মৃত হয়েন নাই। মহাবামনে কথিত আছে,

"সরস্বতী স্মরণমাত্রেই সর্ব্ববিধ পাপক্ষয় করেন। তদীয় তীর্থ সকলের স্মরণ করিলেও পুণ্য হয়, দর্শন করিলে পাপবিনাশ হয়। সরস্বতীতে অবগাহন করিলে যুগপৎ দুষ্কৃতিনাশ ও সুকৃতি সঞ্চয় হইয়া থাকে। ধীমান্ ব্যক্তি সরস্বতীর তটভূমিতে বাস করিলে তাঁহার ব্রহ্মময় জ্ঞান উৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই।"

সরস্বতীর প্রতি হিন্দুসন্ততির ভক্তি ও অনুরাগ দৃষ্টান্তস্বরূপ। অদ্যাপি কুরুক্ষেত্রের যাত্রী সকল লুপ্তপ্রায় সরস্বতীকে স্পর্শ করিয়া আত্মাকে পবিত্র মনে করেন।

আজি সরস্বতী লুপ্তপ্রায় বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি অবিনশ্বর। তাঁহারই তীরে আর্য্যজাতি সর্ব্ব প্রথমে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন; তাঁহারই অন্ন বলে, সমস্ত ভারত তাঁহাদের জয় ঘোষণা করে; এবং তাঁহারই তীরে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে বেদ ও বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই আজি সভ্য জগতে মানবহৃদয়ের অতি উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

দেবাসুর।

সকলেই দেব ও অসুরের নাম এবং তাঁহাদের পরস্পর যুদ্ধের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কে, কোথাই বা বাস করিতেন, কিরূপেই বা তাঁহাদের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। এই প্রবন্ধে তদ্বিষয়ের অলোচনা করা যাইতেছে।

অতি পূর্ব্বকালে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের প্রান্তদেশে এক অতি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ ঈশ্বরপরায়ণ জাতি বাস করিতেন। তাঁহারা ভূমিকর্ষণ ও পশুপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, এবং আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন।

আর্য্যগণ বরুণ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতেন, এবং উপাস্যদিগকে দেব ও অসুর এই উভয় নামেই অভিহিত করিতেন। যে বরুণকে তাঁহারা একবার দেব বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন, তাঁহাকেই আবার অসুর বলিয়া সম্ভাষণ করিতে তাঁহাদের কোন আপত্তি হইতনা।

সাধারণের পক্ষে এইরূপই ছিল। অনন্তর কোন কোন মহাত্মা উপাসনা কালে অসুর শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না; তাঁহারা কেবল দেব নামেই উপাসনা করিতেন। কি কারণে তাঁহারা এইরূপ করিতেন, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অসুর শব্দের অনিষ্টক্ষেপণশীল অর্থ দেখিয়া বোধ হয়, যে সকল চিন্তাশীল পুরুষ ঈশ্বরের সর্ব্বমঙ্গলময়ত্ব অনুভব করিতেন, তাঁহারাই আর অসুর শব্দ উচ্চারণ করিতেন না; উপাস্য-

দিগকে কেবল দেব অর্থাৎ দীপ্তিমান্ বলিয়াই সংবর্দ্ধনা করিতেন।

কালে এই কথা লইয়া মহান্ আন্দোলন উপস্থিত হইল। উপাসনা কালে অসুর শব্দ পরিত্যাগ অনেকেরই অতীব গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি হইল। তাঁহারা প্রতিযোগিতায় দেব-শব্দ পরিত্যাগ করিয়া উপাস্যদিগকে কেবল অসুর নামেই অভিহিত করিতে লাগিলেন। প্রাচীন দেবতা সকল উভয় পক্ষেরই উপাস্য রহিলেন; কিন্তু পরস্পর বিদ্বেষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে এই দেবোপাসকেরাই দেব, এবং অসুরোপাসকেরাই অসুর বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

অসুরোপাসক আর্য্যসন্ততিরা পরবর্ত্তী কালে জগতে ইরানীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সিন্ধুর পশ্চিম হইতে আরবের প্রান্ত, এবং পারস্য সাগর হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ইরান নামে অভিহিত ছিল। ইরানীয় দিগের অবস্থা নামক ধর্ম্মশাস্ত্রে দেববিদ্বেষের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,

'সুশস্য হইলে দেবগণ যাতনায় চীৎকার করে; যব উৎপন্ন হইলে দেবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং যখন প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, তখন দেবগণের গ্রীবার মধ্যে তাপরক্তিম লৌহ-দণ্ড ঘুরিতে থাকে।

'বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রপতি মিত্রের রথের পার্শ্বে যে সকল সুনির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ বর্ষা আছে, তাহা আকাশে দেবগণের কঙ্কালের উপর দিয়া গমন করে।

হে জারাথস্ত্র? যখন তুমি পলায়মান দেবগণকে আক্রমণ কর, তখন কেবল এই কথাই বলিও, দেবগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, দেবোপাসকগণ ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।”

যে হউক, সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সহস্রবর্ষব্যাপী করাল যুদ্ধরূপে পরিণত হইল। দেবোপাসকেরা একতঃ সংখ্যায় অল্প ছিলেন, তাহাতে প্রথম হইতেই পরমার্থচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিয়া যুদ্ধ বিদ্যায় তাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ অসুর পক্ষই জয়লাভ করিলেন। তাঁহারা কেবল জয়লাভ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, ইরানের ফলপুষ্প-শোভিত সুন্দর উপত্যকা হইতে দেবোপাসকদিগকে জন্মের মত বিদায় করিয়া দিলেন।

পরমার্থ পরায়ণ মহাত্মাগণ বেদ ও ইন্দ্রের সহিত ভারতবর্ষ আশ্রয় করিলেন। সেই প্রাচীন বাসস্থান হইতে আর্য্যদিগের ভারতে আগমনই অসুর তাপে ইন্দ্রের স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যধামে পতন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

অহমিকাশূন্যতা।

কোন কার্য্য করিয়া ‘আমি করিয়াছি’ বলিয়া পুনঃ পুনঃ গৌরব প্রকাশ করিলে অহমিকা হয়। যাঁহারা প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া বিরলে আপন গৌরবে আপনি মত্ত হয়েন, বা অন্যে আমার নাম করিয়া বলুক, মনোমধ্যে এইরূপ আশা পোষণ করেন, তাঁহাদের চরিত্র ও অহমিকা দোষে দূষিত না হয় এমত নহে।

আর্য্যেরা যখন ভারতে সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রু তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। সেই সকল আদিম অধিবাসীরা সাহসী উগ্রস্বভাব ও অতীব দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া আর্য্যেরা ভারতে এক বর্গহস্ত পরিমিত স্থানেরও প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। কথিত আছে, 'মহা পরাক্রম-শালী কৃষ্ণ দশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে অংশুমতীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিল'।

এখন কে ইহাদিগকে নিরস্ত করিলেন? কোন্ বীরপুরুষ সেই দুরন্ত দস্যুদিগের হস্ত হইতে মুখ্য পাত্রের জন্য স্বর্ণভূমি জিতিয়া লইলেন? প্রাচীনঋষিদিগের মধ্যে কেহই ইহার কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন ভগবান্ ইন্দ্রই দস্যুদিগকে দমন করিয়াছিলেন। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি বলিতেছেন "যে ইন্দ্র কৃষ্ণ প্রভৃতি দস্যুদিগকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।"

কুৎস আত্মপরিচয় দেন নাই, ফলতঃ তিনিই সেই অগ্রগামী বীর; তিনিই ভারতবিজেতা ধনুর্দ্ধর। কৃষ্ণ কুযব শম্বর শুষ্ণ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দস্যু সকল যে তাঁহারই হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমরা নিম্নলিখিত সূক্তপাঠে অবগত হইতে পারি।

মহর্ষি বামদেব বলিতেছেন,

"হে ইন্দ্র! তুমি মনে মনে দস্যুবধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কুৎসের গৃহে আগমন করিয়াছিলে, কুৎসও তোমার সখ্যের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।

"হে ইন্দ্র! যেদিন কুৎস আপন রথে ঋজুগামী অশ্বদ্বয় যোজিত করিয়া জয়লাভ করেন, সেইদিন তুমিই তাঁহার সহিত এক রথে গমন করিয়াছিলে।

"হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের জন্য শুষ্ণকে বধ করত দিবসের প্রারম্ভে কুযবকে নাশ করিয়াছিলে। জরা যেমন রূপ বিনাশ করে, তুমি সেইরূপ শম্বরের নগর সমূহ বিনাশ করিয়াছ। হে ইন্দ্র! পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রু তোমা কর্ত্তৃকই বিনষ্ট হইয়াছে।"

আর্য্যেরা সকল কার্য্যই ঈশ্বরে আরোপ করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহারা কার্য্য মাত্রেই ঈশ্বরের হস্ত এমন বিনিযুক্ত দেখিতে পাইতেন, যে তাঁহাদের চক্ষে লৌকিক কর্ত্তৃত্ব অতীব তুচ্ছ ও অনুল্লেখযোগ্য বলিয়া বোধ হইত। ইহাই অহমিকা শূন্যতার কারণ, এবং এই বিষয়ে কোন জাতিই ভারতীয় আর্য্যদিগকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

অস্থিদান।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি যাবতীয় অহিন্দু জাতির চির দিনই বিদ্বেষভাব লক্ষিত হয়। জগতের ইতিবৃত্তে চারি সহস্র বৎসরাবধি যখন যে জাতি প্রবল হইয়াছেন, সনাতন আর্য্যধর্ম্ম লোপ করাই তাঁহাদের অভ্যুত্থানের অন্যতম গরিষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু জাতির পর জাতি, ধর্ম্মের পর ধর্ম্ম, উদিত ও অস্তমিত হইয়াছে, পরমার্থবিৎ হিন্দু কিছুতেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই।

অসুরগণ দেবোপাসক দিগকে ইরান হইতে দূরীকৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না; যাহাতে তাঁহারা এজগতে কোথায়ও দাঁড়াইতে স্থান না পান তদ্বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইরানীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে "আমি ইন্দ্রকে এই গৃহ হইতে, এই পল্লী হইতে এই নগর হইতে, এ পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই।"

অতএব দেবেরা যে ভারতে আসিয়া ইন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন, অসুরদিগের চক্ষে তাহাও অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা আসিন্ধু প্রদেশে জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দেবযজ্ঞ নাশে ব্যাপৃত হইলেন। চকিত ও সন্ত্রস্ত দেবকুলের কর্ণে "ইন্দ্র পরিত্যাগ কর" এই সিংহনাদও মুহুর্মুহুঃ প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। দেবগণ সাতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে মহর্ষি দধীচি প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি অথর্ব্বার পুত্র, যিনি মনু অঙ্গিরা ভৃগু প্রভৃতি ঋষির ন্যায় ভারতে যজ্ঞ বিস্তারের একজন প্রধান নেতা ছিলেন।

দধীচি পিতার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কথিত আছে, "অশ্বিদ্বয় স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে অশ্বের মস্তক পরাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র ক্রোধবশতঃ তাহা ছেদন করিয়া ফেলেন।' এই গভীর বৈদিক উপমার তাৎপর্য্য এই যে, দধীচি পূর্ব্বে অশ্বিদ্বয় নামক দেবতার উপাসক ছিলেন, পরে স্বকীয় ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিয়া ইন্দ্রের উপাসক হয়েন। 'ইন্দ্র তাঁহাকে নানাবিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন।' দধীচির অনন্যসাধারণ গভীর জ্ঞানবত্তা দেখিয়াই যে লোকের তাদৃশ ধারণা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন দধীচি ঐন্দ্রযজ্ঞবিস্তারে যত্নবান্ হইলেন। অসামান্য দেবপ্রিয়তা এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইতে তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব নির্ভীকতার উদয় হইল। তিনি তখন দুরন্ত অসুরগণের উত্তোলিত অসির নিম্নে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

কি ঐশ্বর্য্যবল, কি বাহুবল, নৈতিকবলের তুল্য কিছুই নহে। দধীচির নির্ভীকতা দর্শনে অসুরেরা স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার অলোকসামান্য তেজস্বিতা দর্শনে জাতীয় হৃদয়ে অপূর্ব্ব সাহসের সঞ্চার হইল। অমনি শত সহস্র নির্ব্বাপিত বেদী যজ্ঞীয় অনলে পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অসুরেরা সূর্য্যকিরণে তাড়িত অন্ধকারের ন্যায় পুনরায় ইরানের গিরি গহ্বর আশ্রয় করিতে লাগিলেন। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র অনন্ত কালের নিমিত্ত পবিত্র আর্য্যহৃদয় অধিকার করিলেন। দধীচির আত্মোৎসর্গই ইহার এক মাত্র কারণ বলিয়া জাতীয় কিংবদন্তী প্রকটিত হইল যে ইন্দ্র দধীচির অস্থি লইয়া অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন।

সুদাস।

কুৎস প্রভৃতি ঋষিরা দস্যুদমনের যে সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন রাজা সুদাসের হস্তেই তাহার পরিসমাপ্তি হয়। ইনি অতি পরাক্রান্ত আর্য্যভূপতি ছিলেন। ইঁহার সময়ে অনার্য্যদিগের দৌরাত্ম্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আর্য্যদিগের পরিত্রাণের উপায় তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিলনা।

কেননা এক্ষণে আর পরমার্থপরায়ণ ঋষিদিগকে যুদ্ধে যাইতে হয় না; তন্নিমিত্ত কতক গুলি আর্য্যসন্তান স্বতন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা সাহসী বলশালী ও বীর প্রকৃতি সম্পন্ন; দস্যুহস্তে স্বজাতিরক্ষা ও যাগ যজ্ঞাদির আধিভৌতিক তাপ নিবারণই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; যাহার সুসাধনার্থে যুদ্ধোপযোগী নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র কল্পিত, এবং অবিলম্বে নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। আর পরমার্থ-বিৎ ঋষিরা তাঁহাদের দীর্ঘায়ুর নিমিত্ত অভীষ্টবর্ষী দেবতা কুলের ধ্যানধারণে কালাতিপাত করিতেছেন।

রাজা সুদাস এই শ্রেণীর বীরসন্ততিদিগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাঁহার জয় পতাকা উড্ডীন হয়। তিনি রথে আরোহণ করিয়া সমর-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেন। প্রকাণ্ড পার্ব্বতীয় অশ্ব সকল তাঁহার রথ আকর্ষণ করিত। তাঁহার বীরোচিত কলেবরে লৌহনির্ম্মিত বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ শোভা পাইত; এবং পৃষ্ঠোপরি শতভীর পূর্ণ তূণীর বিলম্বিত থাকিত।

তৎকালীয় বীরপুরুষদিগের ধনু র্বিদ্যায় পারদর্শিতা বুঝাই-বার জন্য ঋগ্বেদে একটী সুন্দর উৎপ্রেক্ষা দৃষ্ট হয়। "যুদ্ধ কালে আসন্ন বিজয় বলিয়া দিবার জন্যই জ্যা সম্মুখবীর পুরুষ দিগের শ্রবণ স্পর্শ করিতেছে।"

মহর্ষি বসিষ্ঠ সুদাসের পৌরহিত্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যজমানের হিতকামনায় ইন্দ্র ও বরুণকে আহ্বান করিতেছেন,

"হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ! তোমাদের বন্ধুতা দেখিয়া গোলিপ্সু যজমানেরা পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন, তোমরা দাস

দিগকে মারিয়া ফেল, সুদাসের উদ্দেশে রক্ষার সহিত আগমন কর।

"হে ইন্দ্র ও বরুণ! ভূমির অন্ত সকল ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে; কোলাহল দ্যুলোক আরোহণ করিতেছে, শত্রু সৈন্য উপস্থিত হইল, তোমরা রক্ষার সহিত আগমন কর।"

অনন্তর বসিষ্ঠ যজমানের জয় কীর্ত্তন করিতেছেন,

"দশজন যজ্ঞ রহিত রাজা মিলিত হইয়াও সুদাস রাজাকে প্রহার করিতে শক্ত হইলনা।

"মন্দ মতিরা দুরভিসন্ধি ক্রমে অদীনা নদীর কূলভেদ করিয়া দেয়, সুদাস মহিমা দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিলেন। চয়মানের পুত্র পালিত পশুর ন্যায় শয়ন করিল।

"নদীর জল গন্তব্য প্রদেশেই গমন করিল। ইন্দ্র সুদাসের জন্য অমিত্রগণকে অপত্যের সহিত বশ করিলেন।

"সুদাস রাজা যশোলাভের জন্য দুইটী জনপদের একবিংশ জন লোককে বিনাশ করিয়াছেন। যুদ্ধে ভেদ ও বিনষ্ট হইয়াছে, কেননা, যে ইন্দ্রের স্তব করে, ভেদ তাহারই অনিষ্ট করিত।

"সুদাসের যশঃ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত। তিনি দাতা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ধন দান করেন; সপ্তলোক তাঁহাকেই ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে।"

দাস।

প্রাচীন কালে দস্যু ও দাস শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইত। উভয়ই ধ্বংসার্থ দস ধাতু হইতে উৎপন্ন। আর্য্যেরা নিরন্তর দ্রোহপরায়ণ আদিম অধিবাসিদিগকে উভয় নামেই অভিহিত করিতেন। কিন্তু দাস শব্দে আজি অপত্যবৎ প্রতি পালনীয় কিঙ্কর। কি প্রকারে ভীতিজনন ঘৃণিত ও বধ্যদাস এক অতি আদরের সামগ্রীরূপে পরিণত হইল, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত সুদাস রাজা প্রবল শত্রুঘাতক হইলেও তাঁহাতে বীরোচিত গুণের অভাব ছিলনা। যে সকল শত্রু পরাজিত হইয়াও বশ্যতা স্বীকার না করিত, তাহারা বিজন অরণ্য ও দুর্গম গিরিগহ্বর পর্য্যন্ত অনুসৃত হইত বটে, কিন্তু শরণাগত-দিগকে দয়া প্রদর্শন করিতে সুদাসের অণুমাত্রও শৈথিল্য ছিলনা।

তিনি বশীভূত দস্যুদিগকে অভয় প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; যাহাতে তাহাদের বিদ্বেষভাব অপনীত হয়, তদ্বিষয়েও যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তৎকালে আর্য্যসমাজে ধর্ম্মকর্ম্মেরই বাহুল্য ছিল, এবং যাগ-যজ্ঞাদি-সমাপনার্থ বিস্তর কায়িক পরিশ্রমের ও প্রয়োজন হইত। দাসেরা যজ্ঞ-গৃহে সাহায্যের নিমিত্ত নিযুক্ত হইল, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে দ্রব্যাদি আহরণ, ও বেদিকানির্ম্মাণ প্রভৃতি, তাহাদের

কর্ত্তব্য নির্ব্বাচিত হইল। এইরূপে তাহারা ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় দাস নামেই অভিহিত হইতে লাগিল।

কালক্রমে তাহাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। অহিংসা-রত রাগদ্বেষাদিশূন্য মহাত্মাগণের সংসর্গে থাকিয়া, কালক্রমে সেই নররক্তপিপাসু দস্যুরা আপন স্বভাব ভুলিয়া গেল। সতত যাগ-যজ্ঞাদি পারমার্থিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকায় সেই পাষাণদুর্ভেদ্য হৃদয়েও ধর্ম্ম-ভাব উদিত হইল। মহান্ আর্য্য চরিত্রের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হইল; যজ্ঞীয় কর্ত্তব্য সকল ভয় ও অসূয়ার পরিবর্ত্তে প্রেম ও অনু-রাগের সহিত নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। আর্য্যেরা ও তাহা-দিগকে অশেষ প্রকারে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদিগের নাম পূর্ব্ববৎ দাসই রহিল।

সেই দাস শব্দ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে। কি ভক্তি কি আনুগত্য কি অনুরাগ, দাস শব্দ সর্ব্বস্থানেই সমভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। পুত্র পিতার দাসত্ব স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, ভৃত্য প্রভুর দাস বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন; আবার স্বয়ং কৈলাসনাথ জগজ্জননীর নিকট 'তব দাসোঽস্মি সুন্দরি' বলিয়াই আপন অপার্থিব অনুরাগ প্রকাশ করিতে-ছেন। ইহা হইতেই এক সময়ে আর্য্য ও অনার্য্য এই উভয়ের মধ্যে কি এক অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। জেতা ও বিজিতে এতাদৃশ সদ্ভাব জগতের ইতিবৃত্তে আর কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয়না। ফলতঃ যাঁহাদিগের সংস্পর্শে দাসের ক্রোধ হিংসা ও বিদ্বেষ

ক্রমশঃ ভক্তি আনুগত্য ও অনুরাগে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহাদের সাধুতার ইয়ত্তা করা দুষ্কর।

স্ত্রীশিক্ষা।

ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত নাই বলিয়া, অনেককেই ভারতীয় আর্য্য জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে সংশয়াবিষ্ট হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যেরা কন্যাদিগকে সুশিক্ষা দান করিয়া আসিতেছেন। কি বৈদিক, কি পৌরাণিক, কোন কালেই তাঁহারা এই বিষয়ে বীতযত্ন বা হতোৎসাহ হয়েন নাই।

প্রায় চারি সহস্র বৎসর অতীত হইল, যখন পৃথিবীর আর কোন স্থানে বিদ্যার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রবেশ করে নাই, পবিত্র সরস্বতী-তীরে আর্য্যেরা বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। বালিকারাও সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে জ্ঞানার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা বেদ অভ্যাস করিতেন, বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেন, কেহ কেহ আবার এমন বিদ্যাবতী হইতেন যে উপাসনার্থে সুন্দর সুন্দর ঋক্ রচনা করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইত না।

যে সমস্ত রমণী বিদ্যাবলে ঋষিদিগকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববারা ও ঘোষা নাম্নী রমণীই সমধিক প্রসিদ্ধ। বিশ্ববারা মাননীয় অত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি বিদ্যা ও তপঃ প্রভাবে ঋষি হইয়া স্বয়ং ঋত্বিকের কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তিনি স্বরচিত যে সকল মন্ত্রে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হে অগ্নি! তুমি সম্যক্ প্রজ্বলিত হইয়া অমৃতের উপর আধিপত্য কর, তুমি হব্যদাতার কল্যাণবিধানার্থ আগমন কর।

হে অগ্নি! তুমিশত্রু সকল দমন করিয়া আমাদিগকে বিপুল ঐশ্বর্য্য দান কর, তোমার দীপ্তি সর্ব্ব দিকে বিস্তৃত হউক, তুমি দাম্পত্যসম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

সকলে আরব্ধ যজ্ঞে হব্যবাহক অগ্নিতে হোম কর, অগ্নির সেবা কর, এবং দেবগণের নিকট হব্যবহনার্থ তাঁহাকে বরণ কর।"

বিদুষী ঘোষা অশ্বিদ্বয় নামক দেবতার স্তব প্রস্তুত করিয়াছিলেন;

"হে অশ্বিদ্বয়! এই আমি তোমাদিগের দুজনকে ডাকিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ পিতা পুত্রকে শিক্ষা দান করেন, তদ্রূপ তোমরাও আমাকে শিক্ষাদান কর; আমার আত্মীয় বন্ধু কেহই নাই, বুদ্ধি ও নাই। আমার দুর্গতি দূর কর।

"হে অশ্বিদ্বয়! আমি রাজকন্যা ঘোষা, যেখানে যাই, তোমাদিগের কথাই কহি, এবং তোমাদিগের বিষয়ই জিজ্ঞাসা করি। কি দিন, কি রাত্রি, তোমরা আমার নিকট অবস্থিতি কর।

"তোমরা উভয়ে আমার প্রতি সদয় হও, আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ কর। আমি যেন পতিগৃহে যাইয়া পতির প্রিয়-

পাত্রী হই। আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান কর।

ঋষিরা কন্যাদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষারই সমধিক প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন। তাঁহাদের নিকট লিখনপঠনাত্মক শিক্ষা অপেক্ষা নিয়ত সদনুষ্ঠানই উহার প্রকৃষ্টতর সাধন বলিয়া প্রতীত হয়। এইজন্যই ভারতে কন্যাদিগের কর্ত্তব্য অশেষ ব্রত নিয়মাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল, এবং এইজন্যই বহুকাল পর্য্যন্ত কন্যাদিগের লিখনপঠনাত্মক শিক্ষার প্রতি সাধারণের তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিলনা।

দান।

কৃপণতা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যতদিন দয়া মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উত্তম বিকাশ না হয়, তত দিন কাহারও হৃদয়ে দানপ্রবৃত্তি সঞ্চারিত হয় না। এই নিমিত্ত বর্ব্বরজাতিদিগের মধ্যে দান শক্তির একান্ত অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। ভারতীয় আর্য্য সন্ততিগণ দানধর্ম্মে যে প্রকার উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাঁহারা দানবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে তৎপর হয়েন। ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"যখন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি যাচ্ঞারব করিতে করিতে উপস্থিত হয়, এবং অন্নভিক্ষা করে, তখন যে অন্নবান্ হইয়াও

হৃদয় কঠিন করিয়া রাখে, এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, জগতে কেহই তাহাকে সুখী করে না।

"কোন কৃশ ব্যক্তি অন্নের জন্য আসিলে যিনি অন্নদান করেন, তিনিই দাতা, তাঁহার সম্পূর্ণ যজ্ঞফললাভ হয়, শত্রু-গণের মধ্যেও তিনি মিত্র লাভ করেন।"

"যদি কোন সঙ্গী নিকটে আইসেন, তবে যে ব্যক্তি বন্ধু হইয়া তাঁহাকে অন্ন দান না করে, সে বন্ধুই নয়। তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত। তাহার গৃহ গৃহই নয়। কোন অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারে ভিক্ষা করা বরং ভাল।

"যাচককে অবশ্য ধনদান করিবে, ধন চিরকাল একস্থানে থাকেনা, রথ চক্রের ন্যায় ঊর্দ্ধাধঃ ভাবে ঘূর্ণিত হয়। যাহার মন উদার নহে তাহার ভোজনেও সুখ নাই; বলিতে কি, ভোজন তাহার মৃত্যুস্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না, বন্ধুকেও দেয় না, সে সকলের পরিত্যক্ত অন্ন ভক্ষণ করে।

"যাহার একঅংশমাত্র সম্পত্তি থাকে, সে দুইঅংশ সম্পত্তির অধিকারীকে উপাসনা করে, যাহার দুই অংশ আছে, সে তিনঅংশবিশিষ্টের পশ্চাদ্বর্ত্তী হয়। চতুরংশবান্ আবার উঁহাদের উপর স্থান গ্রহণ করেন। অতএব কেহ তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছে দেখিয়া বিরক্ত হইওনা, কেননা তুমিও বোধ হয় অন্য কাহাকেও বিরক্ত করিয়া থাক।

"আমাদিগের দুই হস্ত পরস্পর সমানাকৃতি বটে, কিন্তু উঁহাদের ধারণক্ষমতা সমান নহে। দুইটী গাভী এক মাতার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াও সমান দুগ্ধবতী হয় না। দুই ব্যক্তি

যমজ ভ্রাতা হইলেও উহাদের পরাক্রম সমান হয় না। দুইজনে একবংশের সন্তান হইয়াও সমান দাতা হয় না।"

মন্যু।

মনুষ্যের হৃদয় যতই ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ হয়, ক্রোধাদি রিপু, ততই সুদূরপরাহত হইতে থাকে। তথাপি ক্রোধবৃত্তি যে অনেক সময়ে মঙ্গলের নিদান স্বরূপ হয়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। ক্রোধ না হইলে শত্রুর দমন হয় না, দ্রোহপরায়ণ দস্যুর শাসন হয় না, এমন কি উন্মার্গপ্রস্থিত বালককেও সৎ-পথে আনয়ন করা যায় না।

তবে কি যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্যোতিঃ উদিত হইয়া, ক্রোধান্ধকারকে এককালে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাঁহাদের নিকট উপরিউক্ত ইষ্ট সমূহের প্রত্যাশা করা যায় না?

বোধহয়, কেবল তাঁহাদের নিকটই পূর্ব্বোক্ত ইষ্ট সমূহের প্রত্যাশা করা যায়; কেননা সেই সকল জিতক্রোধ মহাত্মা স্ব স্ব প্রয়োজনমত ক্রোধবৃত্তির পুনরুত্তেজনা করিতে পারেন। তাঁহাদের রক্তও উষ্ণ হয় না, শরীরও থর থর কম্পান্বিত হয়না, মস্তিষ্কও বিকৃতভাব ধারণ করে না; অথচ তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন। চক্ষু ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া তাঁহাদের ক্রোধন-ভাব প্রকাশ করে। তাঁহারা জানিতে পারেন যে তাঁহারা ক্রোধ করিয়াছেন, এবং প্রয়োজনমত ক্রোধমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিতেও সমর্থ হয়েন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ক্রোধই সর্ব্বথা সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে পরমার্থবিৎ ঋষিরা প্রয়োজন হইলে চিরনিদ্রিত ক্রোধবৃত্তির চৈতন্য সম্পাদন করিতেন, এই সম্বন্ধে ঋগ্বেদে একটী মনোহর সূক্ত দৃষ্ট হয়।

"হে ক্রোধ! আইস, তুমি বজ্রতুল্য, যে ব্যক্তি তোমার পরিচর্য্যা করে, সে তেজঃ ও বল প্রাপ্ত হয়; তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা যেন দস্যুজাতিকে পরাভব করিতে পারি। তুমিই শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ, তুমি আমাদের সেনা-দিগকে তেজোযুক্ত কর।

"হে ক্রোধ! তুমি অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া শত্রু পরাভব কর, এই নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করা হইয়াছে। তুমি আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ হও; এবং তেজঃ সৃষ্টি করিয়া বিপক্ষ দিগকে দূরীভূত কর।

"তুমি এক, কিন্তু অনেকে তোমার স্তব করে। তুমিই প্রত্যেক মনুষ্যকে যুদ্ধের জন্য তীক্ষ্ণতেজা কর। আমরা তোমাকে মিনতি করিতেছি, তুমি এখন স্থানান্তরে চলিয়া যাও; কিন্তু যখন তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখন আমাদিগের সহায় থাকিও।

ভাষা।

সংস্কৃত অতি সুন্দর ভাষা, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য এক দিনে সংসাধিত হয় নাই। প্রাচীন আর্য্যদিগকে শত শত বৎসর ইহার উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের হস্তে ইহা এতাদৃশ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, জগতে ইহার

হায় অপরিবর্ত্তনশীল ভাষা আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভ্য জগতে অদ্যাপি অনেক ভাষা নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

ভাষা মনুষ্যের অতি প্রাচীন ধন; এবং জাতিমাত্রেই কোন না কোন ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু কি প্রকার লোকদিগের দ্বারা ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইবার সম্ভাবনা?

ঋগ্বেদে কথিত আছে,—"হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্ব প্রথম বস্তুর নাম মাত্র করিতে পারে, তাহাই তাহাদের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান। তাহাদের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত থাকে, বাগ্দেবীর অনুগ্রহে ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ পায়।

"যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কৃত করা হয় তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের বচনরচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে।

"বুদ্ধিমান্‌গণ যজ্ঞের দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন; ভাষা তাঁহাদিগের অন্তঃকরণেই ছিল। তাঁহারা তাহা আহরণ পূর্ব্বক নানাস্থানে বিস্তার করিলেন, সপ্তছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে।

"কেহ কেহ কথা দেখিয়াও কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারে না, কেহ শুনিয়াও শুনেনা। ভার্য্যা যেমন স্বামীর নিকট রূপ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ বাগ্দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিতা হয়েন।

পণ্ডিত সমাজে কোন কোন ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠা হয় যে সে উত্তম ভাবগ্রাহী, তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন কার্য্য করা হয় না। কেহ বা ফলপুষ্পবিহীন অসার বাক্য উচ্চারণ করে।

"যে হ্রদের জলে কেবল কক্ষ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হয় না, কাহারও বাক্য তাদৃশ অগভীর। যাঁহাদিগের চক্ষু ও কর্ণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাবপ্রকটন বিষয়ে অসাধারণ, তাঁহারা সুগভীর হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন।"

উদ্ধৃত অংশপাঠে প্রতীতি হয় যে, আর্য্যেরা প্রথম হইতেই বাক্য অর্থ ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ছন্দ ও লক্ষ্মীর প্রতি তাঁহাদিগের একান্ত যত্ন ছিল, সুবক্তার যশেও দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই প্রকার প্রারম্ভই যে দেবভাষার ভাবি-উন্নতির পথপরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

জাতি।

আর্য্য সমাজে জাতিভেদ-প্রথা অনেকেই কুপ্রথা বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণেরাই এই কুপ্রথার প্রবর্ত্তক। কিন্তু চিন্তাশীল লোকেরা জাতিভেদের জন্য শ্রেণীবিশেষকে দোষী করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে যাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, দেবভাষা যাঁহাদের করায়ত্ত ছিল, পরবর্ত্তীকালে তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, প্রতিভাবলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

ঐরূপ বুদ্ধির অল্পতা বা আলস্য বশতঃ যাঁহারা দৈবকার্য্যে বিশিষ্টতা লাভ বা দেবভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকেই অপেক্ষাকৃত হীনভাবে থাকিতে হইয়াছে।

মহর্ষি বৃহস্পতি বলিতেছেন,

"যখন অনেক স্তোতা একত্র হইয়া মনের ভাব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কেহ কেহ স্তোত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হয়েন; কিন্তু কোন ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না।

"এই যে সকল ব্যক্তি যাহারা ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করে না, বা স্তুতি প্রয়োগ্ধ করেনা, কেবল দোষাশ্রিত ভাষা ব্যবহার করে, তাহারা তন্তুবায়ের কার্য্য বা হলচালনা করিবার উপযুক্ত।"

স্থানান্তরে শিশুনামক ঋষি বলিতেছেন, "হে সোম! সকল ব্যক্তির কার্য্য এক প্রকার নহে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, আমাদিগেরও কার্য্য নানাবিধ। দেখ আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভর্জ্জন করেন। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন কামনায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছি।"

অতএব জাতিভেদ একদিনে সংগঠিত হয় নাই, কিংবা কোন যথেচ্ছাচারিণী প্রভুশক্তিও ইহাকে প্রবর্ত্তিত করে নাই। ইহা অতি অলক্ষ্যভাবে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এমন নিরপেক্ষতা এবং আবশ্যকতা ইহার মূলে কার্য্য করিয়াছে, যে কেহই ইহার অনুশাসনে পীড়া বোধ করে নাই। ইহা স্বতঃপ্রবৃত্ত, এবং স্বভাবরূপে পরিণত। ইহাতে শ্রেণী

বিশেষের অভিপ্রায় বা স্বার্থপরতা প্রমাণের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

দক্ষিণা।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে যজ্ঞান্তে দক্ষিণা-দানের প্রথা প্রচলিত আছে। দক্ষিণা যজ্ঞ কর্তার দেয় পুরোহিতের বর্তন; দক্ষিণা ব্যতীত কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

অনন্তর যাঁহারা দক্ষিণাগ্রহণে ব্রাহ্মণের কোন প্রকার ধন-লোভ অনুভব করেন, তাঁহাদিগকে প্রতিবাদের ভয় না করিয়া বলা যাইতে পারে, যে দক্ষিণাই ব্রাহ্মণের আত্মত্যাগের পরিচয়। কেন না যে সময়ে এক দিকে রাজদণ্ড ও অন্যদিকে দক্ষিণা তাঁহার করপ্রার্থী হইয়াছিল, তিনি রাজদণ্ড উপেক্ষা করিয়া দক্ষিণাকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; মূর্তিমান্ ঐশ্বর্য্যও তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই। তিনি অবলীলাক্রমে অপরকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সামান্য মাত্র দক্ষিণাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অনন্তর এই সামান্য প্রাপ্যকে তিনি কত বহু মনে করিতেন, কত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেন, ও দাতাকে কিরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেন, উদ্ধৃত অংশ পাঠে তাহা সম্যক্ অবগত হইতে পারা যায়।

"এই দক্ষিণা হইতে আমাদের আত্মাস্বরূপ আহার প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞ ব্যক্তি দক্ষিণাকে দেহরক্ষোপযোগী কবচের ন্যায় ব্যবহার করেন।

"দক্ষিণা হইতে গাভী অশ্ব কুত্রাপি মনঃপ্রীতিকর স্বর্ণও লাভ হয়। যাহারা দক্ষিণা দেয়, তাহারা স্বর্গে উচ্চ আসন পাইবার উপযুক্ত।

"অশ্বদাতা সূর্য্যের সহিত মিলিত হয়, স্বর্ণদাতা অমরত্ব লাভ করে, বস্ত্রদাতা সোমের নিকট যায়, সকলেই দীর্ঘায়ুঃ হয়।

"দক্ষিণা দৈবতকর্ম্মের পূর্ণতাপ্রাপ্তি-স্বরূপ, ইহা পূজার অঙ্গ, যে সকল ব্যক্তি দক্ষিণা দেয়, তাহারা নিজকর্ম্ম পূর্ণ করিতে পারে।

"দক্ষিণাদাতাকে সকলের অগ্রে আহ্বান করা হয়, তিনি গ্রামের অধ্যক্ষ এবং সকলের অগ্রগামী, তাঁহার মৃত্যু নাই।"

একতা।

অনেকে বলেন কোন কালেই ভারতে জাতীয় একতার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদি ইউরোপীয় বণিক্ সম্প্রদায়ের একত্রীভূত হইয়া ব্যবসাদি করাই জাতীয় একতার উত্তম দৃষ্টান্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইতে পারে। কেননা আর্য্যেরা কোন বৈষয়িক ব্যাপার বা পার্থিব লাভালাভের জন্য দশজনে মিলিত হইতেন না। তাঁহাদের একতা তদপেক্ষা মহত্তর ভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহারা

ধর্ম্মকর্ম্মের নিমিত্ত জাতীয় মিলনের একান্ত আবশ্যকতা অনুভব করিতেন। এই প্রকার একতা সংজ্ঞান বা ঐকমত্য নামে অভিহিত হইত। সংবলন নামক ঋষি তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

"হে স্তবকর্ত্তাগণ! তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন।

"এই সকল পুরোহিতদিগের মন্ত্রোচ্চারণ একপ্রকার হউক, ইঁহারা এক সঙ্গে সমাগত হউন, ইঁহাদের মনঃ ও হৃদয় সকলি এক প্রকার হউক। হে পুরোহিতগণ! আমি তোমাদিগকে একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদের সর্ব্বসাধারণের দ্বারা হোম করিতেছি।

"তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে ও সম্পূর্ণ-রূপে একমত হও।"

চিকিৎসা।

সুচিকিৎসা সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ। ভারতীয় আর্য্যগণ ইহার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসায় দুইটী প্রধান বিষয়ের প্রয়োজন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম। জ্ঞানের দ্বারা রোগ ও তাহার উপযুক্ত ঔষধি স্থিরীকৃত হয়, ধর্ম্মের দ্বারা তাহা রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে বিতরিত হয়।

অতি প্রাচীন কালেও আর্য্যেরা অনেক প্রকার ওষধি ও তাহাদের ক্রিয়া অবগত ছিলেন। ওষধি বিশেষ যে মনুষ্য-শরীরের স্থানবিশেষে ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহাও তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা কোন ঔষধি সেবন করাইয়া পুনরায় অন্য ঔষধির দ্বারা তাহার ক্রিয়াবর্দ্ধন করিতেও জানিতেন।

" হে জননীস্বরূপ ওষধিগণ! তোমরা মৃত্তিকাতে উৎপন্ন, তোমাদিগের ক্রিয়া শতপ্রকার, তোমরা আরোগ্য বিধান কর। তোমরা যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচরণ কর, তাহার রোগ সেই সেই স্থান হইতে দূরীভূত হয়।

হে ওষধি! তোমাদিগের একজন আর একজনকে রক্ষা করে, তাহাকে আর একজন রক্ষা করে, এইরূপে সকলে পরস্পর একমত হইয়া কার্য্যকারী হও।"

আর্য্যেরা রোগনিবারণার্থে অনেক সময়ে মন্ত্র ব্যবহার করিতেন। মন্ত্র ইচ্ছাশক্তির বিকাশক, ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। যদি বস্তুতঃ তাহাই হয়, তবে যে সকল ঋষিরা রোগ-উপশমের জন্য মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা দুষ্কর। অপর যাঁহারা ইচ্ছাশক্তি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন, তাঁহারা মন্ত্র-বিষয়ে প্রাচীন ঋষিদিগের অসামান্য উপচিকীর্ষার পরিচয় পাইতে পারেন। কেননা যে সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের তাদৃশ সমুন্নতি হয় নাই, রোগ নির্ণীত, বা রোগ সকলের যথাযথ ঔষধিও আবিষ্কৃত হয় নাই, সমাজের তাদৃশ অভাবের অবস্থায় আর্য্যঋষিরা বিপন্ন ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন, "ভয় নাই এখনই রোগ-শান্তি করিয়া দিতেছি।"

"হে রোগি! তোমার চক্ষু কর্ণ নাসা চিবুক মস্তক বা জিহ্বা এই সকল অবয়ব হইতে আমি যক্ষ্মা অর্থাৎ রোগ তাড়াইয়া দিতেছি।

"তোমার গ্রীবাস্থিত শিরাসমূহ হইতে, স্নায়ু হইতে, অস্থি সন্ধি বাহু স্কন্ধ প্রভৃতি অবয়ব হইতে ব্যাধি বিদূরিত হউক।

"তোমার অন্ননাড়ী ক্ষুদ্রনাড়ী হৃদয়স্থান মূত্রাশয় যকৃৎ ও মাংসপিণ্ড হইতে আমি ব্যাধিকে অপসারিত করিলাম।

"হে রোগি! তুমি শতশরৎকাল জীবিত থাক। ইন্দ্র অগ্নি সবিতা বৃহস্পতি তোমাকে শত বৎসর পরমায়ুঃ প্রদান করুন।

"হে রোগি! আমি তোমাকে পাইয়াছি। তোমাকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। তুমি পুনর্ব্বার নবীন হইয়া আসিয়াছ।"

এই প্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে হিতব্রত মহর্ষিরা রোগীর অঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের পবিত্র করস্পর্শে অনেকানেক উৎকট ব্যাধিরও উপশম হইত।

বিবাহ।

বিবাহ সম্বন্ধে মনুষ্যের হাত নাই। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে পরিণতবয়স্ক অন্ধের সহিত চারুনেত্রা বালিকার, এবং দীন হীন কাঙ্গালের সহিত রাজতনয়ার, বিবাহও অসম্ভাবিত নহে। বরকন্যার মিলন এবং নবদম্পতির সুখসৌভাগ্য মানবযত্নের অধীন নহে, উহা সর্ব্বনিয়ন্তা প্রজাপতির হস্তে নির্ভর করে, পরমার্থবিৎ হিন্দুসন্ততিরা এইরূপ বিশ্বাস করেন।

প্রাচীন কালে ও আর্য্যসমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। তখন ভগবান্ প্রজাপতি বিশ্বাবসুনামে অভিহিত হইতেন।

প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার প্রতি বিশ্বাবসুর অধিকার জন্মিত; তাহাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা বিশ্বাবসুর ইচ্ছা, তাহাদের সুখ-সৌভাগ্য সকলই বিশ্বাবসুর হাত।

ঋগ্বেদে কথিত আছে, —

"হে বিশ্বাবসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তোমাকে নমস্কার করি। আর যেকোন কন্যা পিতার গৃহে বিবাহের বয়স পাইয়াছে, তাহার নিকট গমন কর, এবং তাহাকে স্বামিসংসর্গিণী করিয়া দাও।"

বিবাহান্তে ঋষিরা অতি মনোহরবাক্যে বরকন্যার সমাদর ও মঙ্গলকামনা করিতেন।

'এই বধূ অতি সুলক্ষণা, তোমরা আসিয়া ইঁহাকে দেখ। যাহাতে ইনি স্বামীর প্রিয় হইতে পারেন, সকলে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও।

"হে অভীষ্টবর্ষি ইন্দ্র! এই বধূ যেন সৌভাগ্যবতী এবং উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হয়েন'।

(বধূর প্রতি) এই স্থানে সন্তান সন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক, এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর এবং বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর।

হে বরবধূ! তোমরা উভয়ে এই স্থানেই থাক, পরস্পর পৃথক্ হইও না, নানা খাদ্য ভোজন কর। আপন গৃহে থাকিয়া পুত্রপৌত্রাদির সহিত সুখে কালযাপন কর।

অনন্তর বরকে বধূর প্রতি এই কয়েকটী বাক্য বলিতে হইত। "তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমার হস্ত ধারণ

করিতেছি। প্রার্থনা করি তুমি আমার সহিত বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও। বদান্যদেবতাগণ সংসারধর্ম্মে সহায়তা করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

"তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়। তুমি দাস দাসী এবং পশুদিগের মঙ্গলবিধান কর। তোমার মন প্রফুল্ল, এবং লাবণ্য উজ্জ্বল হউক। তুমি বীরপুত্রপ্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্তিমতী হও।"

অক্ষ।

এক সময়ে ভারতে অক্ষক্রীড়ার সাতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। লোকেরা ক্রীড়াপরবশ হইয়া কর্ত্তব্যবিমুখ, শ্রীভ্রষ্ট, সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি দারপুত্রত্যাগী ও হইয়া পড়িত। মহর্ষিকবষপ্রণীত নিম্নলিখিত প্রবন্ধে তাহা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ছকের উপর সঞ্চালিত পাশা দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হয়। মুজবান্ পর্ব্বতে যে সোমলতা জন্মে, তাহার রস, এবং বিভীতককাষ্ঠনির্ম্মিত অক্ষ, উভয়ই আমার নিকট সমান প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়।

যে ব্যক্তি পাশক্রীড়া করে, সে কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিলে দিবার লোক কেহই নাই। যেরূপ বৃদ্ধঘোটককে কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করেনা, সেইরূপ দ্যূতকার কাহারও নিকট সমাদর পায় না।

'পাশাগুলি কখনও দ্যূতকারের জয়াশা পরিপূর্ণ করে। জয়ী ব্যক্তি জয়কে পুত্রজন্মের তুল্য সুখকর জ্ঞান করে। সভার মধ্যে পরাভব নিয়তই মৃত্যুতুল্য হইয়া উঠে।

'এই যে পাশাগুলি দেখিতেছ, ইহারা কাহারও বশীভূত হয় না; রাজা ও ইহাদিগকে নমস্কার করেন।

'ইহারা কখনও নীচে নামিতেছে, কখনও উপরে উঠিতেছে। ইহাদিগের হাত নাই, কিন্তু যাহার হাত আছে, সে ইহাদের বশীভূত। ইহারা দেখিতে স্থন্দর, স্পর্শ করিতেও শীতল, কিন্তু হৃদয়কে দগ্ধ করে।

'দ্যূতকারের স্ত্রী দীনবেশে পরিতাপ করে, তাহার পুত্র কোথায় যায়, তাহার মাতা ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়। যে তাহাকে ধার দেয়, সে আপন ধন ফেরত পাইব কিনা, এই ভাবিয়া সশঙ্কিত। দ্যূতকারকে পরের বাটীতে রাত্রি যাপন করিতে হয়।

'পরিবারবর্গের দুর্দ্দশা দেখিয়া দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যের সৌভাগ্য ও স্থন্দর অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ জন্মে। সে সন্ধ্যাকালে শীত নিবারণের জন্য বস্ত্রের অভাবে অগ্নিসেবা করে।

'হে পাশাগণ? যে তোমাদের দলের মধ্যে প্রধান, আমি তাহাকে এই দশ অঙ্গুলি একত্র করিয়া প্রণাম করিতেছি। সত্যকরিয়া বলিতেছি আমি তোমাদের নিকট অর্থ চাহিনা।

'হে দ্যূতকার! পাশা আর খেলিওনা, বরং কৃষিকার্য্য কর, তাহাতে যাহা লাভ হয়, সেই লাভে সন্তুষ্ট হও, ও আপনাকে কৃতার্থ বোধ কর।

'হে পাশাগণ! আমাদের উপর বন্ধুত্বভাব ধারণ কর, আমাদিগের কল্যাণ কর। আমাদের প্রতি স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ ভাব প্রয়োগ করিওনা। শত্রুই যেন তোমাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়। শত্রুই যেন তোমাদিগকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে।'

এই বৈদিক সময়ের শেষভাগ। এখন আর যুদ্ধবিগ্রহাদি নাই। দিক্ সকল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। আর্য্যেরা নিরুপদ্রবে স্ববীর্য্যলব্ধ ভারতের ধনসম্পৎভোগ করিতেছেন। আর্য্যগৃহে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। আর্য্যহস্তে অসির পরিবর্ত্তে অক্ষ শোভা পাইতেছে; ভীষণ বজ্রমুষ্টি আজি শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাই চরম নহে। পরবর্ত্তী কালে লোকে অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব হইলেও ক্ষান্ত হইত না, আত্মীয় স্বজন পণ করিয়াও খেলা করিত। মহামান্য হস্তিনার রাজচক্রবর্ত্তিগণও এই ব্যসনে পতিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা পতিব্রতা ভার্য্যা কৃষ্ণাকে পণ করিয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, কৌরবগণ তাঁহাকে জিতিয়া লয়েন, এবং সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কুলকামিনীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করেন। তাঁহারা তখন জানিতেন না, যে এই অক্ষপাপ কুরুজাঙ্গলে লক্ষাধিক নরঃরক্তে ও প্রক্ষালিত হইবে।

গাভী।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে গোবধের নিদর্শন পাওয়া যায়। গৃহে অতিথি আসিলে, তাঁহার সৎকারার্থে গোবধ করা হইত, বলিয়া অতিথির এক নাম গোঘ্ন হইয়াছিল। কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের এরূপ ভ্রম না হয়, যে আর্য্যেরা অন্যান্য জাতির ন্যায় গাভীকে হেয় জ্ঞান করিতেন, বা গাভীর প্রতি যথেচ্ছাচার

করিতেন, বা তাহার গুণনিচয়ে এককালেই চক্ষুরুন্মীলন করিতেন না। যে কৃতজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আজি গাভীকে পরমোপকারিণী দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছি, ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থেও তাহার অঙ্কুরসমূহ দৃষ্ট হয়।

মহর্ষি শবর বলিতেছেন.

'সুখকর বায়ু গাভীদিগকে বীজন করুন; গাভীগণ বলধায়ক তৃণপত্রাদি আস্বাদন করুক; গাভীরা প্রাণপরিতৃপ্তিকর প্রচুরজলপান করুক। হে রুদ্রদেব! এই চরণবিশিষ্ট অন্নরূপ গাভীগণকে স্বচ্ছন্দে রাখ।

'গাভীগণ কখনও একবর্ণের, কখনও বা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইয়া থাকে। মহর্ষিরা তপস্যা দ্বারা তাহাদিগকে পৃথিবীতে সৃষ্ট করিয়াছেন। হে পর্জ্জন্যদেব! তাহাদিগকে সুখস্বচ্ছন্দ বিতরণ কর।

'গাভীগণ দেবযজ্ঞের নিমিত্ত আপনার শরীর দান করে। হে ইন্দ্র! তাহাদিগকে দুগ্ধে পরিপূর্ণ ও সন্তানযুক্ত করিয়া আমাদিগের জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া দাও।

'দেবতা ও পিতৃলোকের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রজাপতি আমাদিগকে এই সকল গাভী উপহার দিয়াছেন, ইহারা কল্যাণযুক্ত হইয়া গোষ্ঠে বিচরণ করুক।'

বর্ত্তমান সময়ে পশুজাতির প্রতি সদ্ব্যবহার সভ্যতার একটী অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ফলতঃ মানবহৃদয়ের যতই বিকাশ হইতে থাকে, সমবেদনা আত্মসদৃশ বস্তু হইতে ক্রমশঃ দূরতর বস্তুতে ব্যাপৃত হয়। এইরূপে অগ্রে স্বজাতি, পরে মনুষ্য মাত্র, এবং সভ্যাবস্থায় নিকৃষ্ট প্রাণীও মনুষ্যের সমবেদ-

নার পাত্র হয়। অতএব আমরা যখন দেখিতে পাই প্রাচীন আর্য্যেরা পশ্বাদির প্রতিও সমবেদনা প্রকাশ করিতেন, তখন তাঁহাদের সভ্যতাসম্বন্ধে, আর অধিক সন্দিহান হইনা। পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা যথাবিধানে পশুপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সভ্যতা কতদূর উত্থিত হইয়াছিল, বিবেচনা কর।

অরণ্যবাস।

অরণ্য মরুভূমির ন্যায় সর্ব্বত্রই মনুষ্যবাসের প্রতিকূল নহে। পূর্ব্বকালে আর্য্যঋষিরা অনেকেই অরণ্যে বাস করিতেন, এবং তথায় অনায়াসলভ্য ফলমূলাদির দ্বারা জীবনধারণ করিতেন। সহজে জীবিকানির্ব্বাহ হওয়াতে, ঋষিরা উচ্চতর চিন্তার যথেষ্ট অবসর পাইতেন; আবার, দুরন্ত সিংহশার্দ্দূলনিবাসিত অরণ্যে, পর্ণকুটীরে একমাত্র ঈশ্বরে নির্ভর করিয়াই কালযাপন করিতেন। অতএব আফ্রিকার মরুভূমির বিসদৃশ, ভারতীয় অরণ্যবাস আর্য্যজাতির গভীর ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং অসাধারণ চিন্তাশীলতার অন্যতম কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু ঋষিরা বনবাসের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। তাঁহাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে বাধ্য হইয়াই অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইত। নগর বা পল্লীতে বাস করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, আবার অর্থ উপার্জ্জন করিতে গেলে পরমার্থচিন্তার ব্যাঘাত জন্মে। মহর্ষি দেবমুনি অরণ্যবাস সম্বন্ধে বলিতেছেন,

'হে অরণ্যানি! তুমি কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা স্থির করা যায়না। তুমি পল্লীগ্রাম হইতে এতদূর, যে তথায় যাইতে হইলে পথ জিজ্ঞাসা করিতে হয়! তোমার কি একাকী থাকিতে ভয় হয়না?

'এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর এক জন্তু চী চী করিয়া তাহার উত্তর দিতেছে। ইহারা যেন নানা স্বরে অরণ্যানীর বর্ণনা করিতেছে। অরণ্যের মধ্যে কোথায়ও যেন গাভী চরিতেছে এইরূপ ভ্রম উপস্থিত হয়, কোথায়ও যেন অট্টালিকার মত দৃষ্ট হয়, সন্ধ্যাকালে উহার মধ্য হইতে যেন কত কত শকট বহির্গত হয়।

'এই যেন একব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে? এই যেন আর একব্যক্তি কাষ্ঠছেদন করিতেছে। যে ব্যক্তি অরণ্যে বাসকরে, সে জ্ঞান করে, যেন সন্ধ্যাকালে কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল।

'বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারও প্রাণবধ করেনা। অন্য অন্য পশু না আসিলে তথায় কোন আশঙ্কা নাই, তথায় সুস্বাদু ফল আহার করিয়া অতি সুখে কালক্ষেপ করা যায়।

'বনস্থলী সততই মৃগনাভির ন্যায় মনোহর সৌরভে পরিপূর্ণ; তথায় কৃষক লোক আদৌ নাই, কিন্তু আহার বিদ্যমান আছে।'

অন্ত্যেষ্টি।

যে সমস্ত কারণে জাতীয় সভ্যতা সূচিত হয়, মৃতের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন তন্মধ্যে সামান্য নহে। যাবতীয় সভ্যজাতির মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে সমাদর করিবার প্রথা প্রচলিত আছে, যৎকালে বর্ব্বর জাতিরা সম্মাননা দূরে থাকুক, মৃতের প্রতি সাতিশয় অবজ্ঞাই প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহারা মুমূর্ষুর জন্য একটীও প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করেনা, মৃতকে যথেচ্ছ পরিত্যাগ করে, কুত্রাপি কুক্কুর দিয়া ভক্ষণ করায়; আবার স্ব স্ব গৃহস্থলীর সম্মুখে শৃগালশকুনিতে মৃত আত্মীয় জনের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করে, তাহাও পাষাণ হৃদয়ে সহ্য করিয়া থাকে।

যে যে কারণে বর্ব্বরেরা এইরূপ করিতে সমর্থ হয়, পারলৌকিক বিশ্বাসের অভাবই তন্মধ্যে প্রথম, এবং দয়া ও সমবেদনার অল্পতা দ্বিতীয় কারণ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

মৃত ব্যক্তির প্রতি হিন্দু জাতির সদ্ব্যবহার জগতে অতুলনীয়। ইঁহারা মুমূর্ষুর কর্ণে ভবভয়হারী হরিনাম উচ্চারণপূর্ব্বক পারলৌকিক কার্য্য আরম্ভ করেন, এবং তাহা পরবর্ত্তী শত বৎসরেও সমাপ্ত হয় না। শ্রাদ্ধ তর্পণাদিক্রমে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মাননা একপ্রকার অনন্তকালের জন্যই চলিতে থাকে। পরলোকের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং অসাধারণ হৃদয়বত্তাই যে ইহার কারণ তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

অতি প্রাচীনকালে আর্য্য জাতির অন্ত্যেষ্টি তাদৃশ বিস্তৃত

ছিলনা বটে, কিন্তু তখনও তাঁহারা মৃতের প্রতি যথেষ্ট যত্ন ও সম্মাননার ক্রটী করেন নাই।

"হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে মিলিত হউক। তুমি তোমার পুণ্যফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। তোমার অবয়ব সকল উদ্ভিজ্জের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক।

"এই মৃত ব্যক্তির যে অংশ অজ, চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশ পুণ্যবান্ লোকদিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও।"

"আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে পথ দিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, হে মৃত! তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও; রাজা যম ও বরুণ, যাঁহারা স্বধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর।

"সেই চমৎকার সর্ব্ব-সুখদ স্বর্গধামে যাইয়া পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হও। যম এবং পুণ্যফলের সহিত মিলিত হও। পাপপরিত্যাগপূর্ব্বক উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর।"

অনন্তর আর্য্যেরা স্বর্গত পিতৃলোকের এই প্রকার অভ্যর্থনা করিতেন, ও তাঁহাদিগের নিকট নানাবিধ প্রার্থনা করিতেন।

"পিতৃলোকগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের হোমের দ্রব্য গ্রহণ করুন। যে সকল পিতৃলোক স্বর্গে দেবলোকের সহিত বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার। হে পিতৃগণ! আমরা মনুষ্য, সুতরাং কোন কিছু অপরাধ করা আমাদিগের সম্ভব, কিন্তু সেই নিমিত্ত যেন আমাদিগকে হিংসা করিও না।

"যে সকল পিতৃলোক হোম করিতে জানিতেন এবং বিবিধ ঋকের দ্বারা স্তব করিতেন, যাঁহারা নিজ নিজ সৎকর্ম্মফলে এক্ষণে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যদি তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে হে অগ্নি, তুমি তাঁহাদিগকে এইস্থানে আনয়ন কর, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য রহিয়াছে।

"হে পিতৃগণ, তোমরা উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ, এই স্থানে আগমন কর, এবং ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন কর। কুশের উপর হোমের দ্রব্যাদি প্রসারিত আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন এবং পুত্রপৌত্রাদি দান কর।"

এই শেষোক্ত অভ্যর্থনা ও প্রার্থনাদিই বর্ত্তমান শ্রাদ্ধরূপে পরিণত হইয়াছে।

রাক্ষস।

বালকেরা রাক্ষসের গল্প শুনিতে অতিশয় ভালবাসে, এবং শুনিবার সময়ে যেমন সন্তুষ্ট হয় তেমনই চকিত ও স্তম্ভিত হইয়া থাকে। সকল হিন্দু-পরিবারেই দুই একটী রাক্ষসের গল্প প্রচলিত আছে।

কিম্ভূত কিমাকার রাক্ষস নিবিড় অরণ্যমধ্যে বাস করে। রাক্ষস দিবাভাগে নিদ্রা যায়, এবং সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে জাগরিত হয়; এই নিমিত্ত ঐ সময়ের নাম রাক্ষসী বেলা হইয়াছে। অধিকাংশ রাক্ষসের সুধাধবলিত প্রকাণ্ড রাজ-

ভবন আছে। রাক্ষস উহা স্বয়ং নির্ম্মাণ করে নাই, কোন রাজাকে সবংশে ভক্ষণ করিয়া, লইয়াছে।

দুরন্ত রাক্ষস সন্ধ্যাকালে বাহির হয়, এবং চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করে। সে অতি নির্দ্দয়, রক্তপিপাসু, ও আমমাংস-ভোজী; তাহার শরীরে দয়ার লেশ মাত্র নাই। মনুষ্য, গো, অশ্ব, মহিষ, যাহা তাহার সম্মুখে পতিত হয়, পাপিষ্ঠ তাহাকেই ধরিয়া লইয়া যায়।

এই প্রকার গল্প, অল্প বা অধিক পরিবর্ত্তনের সহিত, সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক রাক্ষস কি? প্রাচীন আর্য্যেরা কাহাকে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন? অনেকে মনে করেন যে আর্য্যেরা দ্রোহপরায়ণ অনার্য্য-দস্যুদিগকে রাক্ষস বলিতেন। দুরন্ত দেববিদ্বেষী অসুরেরও ঐ নামে অভিহিত হওয়া, তাঁহাদের নিকট সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ঋগ্বেদে রাক্ষসের যে সকল লক্ষণ ও গুণাগুণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে রাক্ষস কোন অমানুষিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি হয়।

"হে ইন্দ্র! যাহারা উলূকরূপে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ কর। যাহারা কুক্কুর, চক্রবাক, শ্যেন, অথবা গৃধ্ররূপে অনিষ্ট করে, সেই সকল রাক্ষসকে মারিয়া ফেল।"

"হে সর্ব্বদর্শিন্! তুমি রাক্ষসদিগের বিষয়ে সতর্ক হও, এবং মনুষ্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। রাক্ষসের তিন মস্তক, তিন পার্শ্ব, এবং তিনটী চরণ ছেদন করিয়া ফেল।

"হে অগ্নি! দেখ, স্ত্রীপুরুষে পরস্পর গালি দিতেছে, আবার চীৎকার করিয়া কটু কথা কহিতেছে; দুরাচার রাক্ষসই উহাদিগকে ঐরূপে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

"যদি আমি রাক্ষস হইয়া পুরুষের আয়ুঃ নাশ করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন এখনই মরিয়া যাই; আর যদি তুমি আমাকে অন্যায় করিয়া রাক্ষস বলিয়া থাক, তোমার যেন দশ বীরপুত্র নষ্ট হয়।"

অতএব রাক্ষস, মনুষ্য বা পশুবিশেষ নহে; হিংসাপ্রিয় ভৌতিক অস্তিত্ববিশেষ। মনুষ্যের অনিষ্ট উৎপাদন করাই তাহার ব্য সায়, এবং তজ্জন্য সে নানা রূপ ধারণ করিতে পারে। সমগ্র আধিভৌতিক তাপ তাহারই করায়ত্ত; ঋষিরা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নিয়তই ইন্দ্রাদিদেবগণের শরণাপন্ন।

নরবলি।

অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন কালে আর্য্যসমাজে নর-বলি প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কথিত আছে, রোহিতের পিতা হরিশ্চন্দ্র রাজা রোহিতকে বলি দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু পুত্র তাহাতে অসম্মত হইলে, তিনি অজীগর্ত্তকে সম্মত করাইয়া তাঁহারই পুত্র শুনঃশেপকে বলি দেওয়া স্থির করেন। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পরামর্শে দেবগণের স্তুতি করিয়া অবশেষে মুক্তি লাভ করেন।

রামায়ণে বালকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋচীক স্বীয় পুত্র শুনঃশেপকে বলির নিমিত্ত অযোধ্যারাজের নিকট বিক্রয় করেন। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের নিকট একটী স্তুতি শিখিয়াছিলেন, আসন্নসময়ে সেই স্তুতি পাঠ করায় ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

উপরি উক্ত গ্রন্থ সমূহ প্রাচীন হইলেও, ঋগ্বেদের অনেক পরে রচিত। ঋগ্বেদে শুনঃশেপের কথা আছে, কিন্তু তাঁহার বলিদানের কোন উল্লেখ নাই। শুনঃশেপ নিজে ঋষি ছিলেন, এবং কয়েকটী সারগর্ভ সূক্তও রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল সূক্তপাঠে প্রতীতি হয়, শুনঃশেপ অতি চিন্তাশীল লোক ছিলেন; তাঁহার চিত্ত ভবভয়ে ভীত, সংসারাশ্রমে বিবিধ-পাশদর্শনে সন্ত্রস্ত, অতএব অভীষ্ট দেবতার নিকট মুক্তির প্রার্থী, ভববন্ধনমোচনের জন্য লালায়িত।

"হে বরুণ! তুমি পাপ দেবতাকে দূরে রাখ, এবং আমাদিগকে কৃত পাপ হইতে মুক্ত কর।

"আমার উপরের পাশ খুলিয়া দাও, নীচের পাশও শিথিল করিয়া দাও। আমরা আর তোমার ব্রত খণ্ডন করিব না, আর পাপ করিব না।

"লোক মাত্রেরই ভ্রম হয়, আমরা ও দিনে দিনে তোমার ব্রতসাধনে ভ্রম করিয়া থাকি, তুমি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইও না, আমাদের আয়ুঃ বর্দ্ধন কর।

"হে বরুণ! তুমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, আমাদের ক্ষেমপ্রাপ্তির প্রার্থনাসকল শুনিলে, এখন উত্তর দান কর।"

এই সকল করুণ ও কাতরভাবব্যঞ্জক উক্তিই পরবর্ত্তী লেখকদিগের রজ্জুতে সর্পভ্রম' জন্মাইয়াছে। তাঁহারা পাশ শব্দের গূঢ়ার্থ পর্য্যালোচনা না করিয়া সাধারণ বন্ধনরজ্জুই ভাবিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। বক্তা যাবতীয় আধিদৈবিক তাপকে উপরের পাশ বলিয়া, হিংস্রজন্তু প্রভৃতির অত্যাচারকে নীচের পাশ বলিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বিশদবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছেন।

অতএব আর্য্যসমাজে কোন সময়েই নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিলনা। পরন্তু অনার্য্যজাতিরা সময়ে সময়ে এই ভয়ঙ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত। নরবলি হইলে পৃথিবী শস্যশালিনী হয়, এ বিশ্বাস তাহাদিগের, এবং তদনুসারে মূর্খেরা বলির মাংসশোণিতে প্রতিবৎসরই শস্যক্ষেত্রসকল কলুষিত করিত। ইহাদিগের হইতে যে এক সময়ে এই কুপ্রথা পবিত্র আর্য্যমন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। ফলতঃ আর্য্যেরা কোন সময়েই এই অবৈধকর্ম্মে লিপ্ত হয়েন নাই।

শচী।

বেদের কথা অবলম্বন করিয়া পুরাণাদিতে যে সকল উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে দেবরাণী শচীর উপাখ্যানই সমধিক আশ্চর্য্য। শচী সুরপতি ইন্দ্রের গৃহিণী; যেস্থানে পবিত্র তটিনী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া অমৃত সলিলে দেব-

কুলকে চরিতার্থ করিতেছেন, সেই সুরপুরী অমরাবতী শচীবাস-পুণ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তথায় কল্পতরু-পরিশোভিত মনোহর উদ্যান, অসংখ্য দাসদাসীসেবিত প্রকাণ্ড রাজভবন, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য, সকলই বাসবপ্রিয়ার ভোগার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। তাঁহার জন্য কামদুঘা দুগ্ধধারা বর্ষণ করে, কিন্নরীরা নৃত্য করে, অপ্সরোগণ মনোহর সঙ্গীতে দিগন্ত আমোদিত করে। তিনিই দুর্দমনীয় অসুরজাতির ভীতি, এবং অনন্ত কোটী দেবের মুক্তির স্বরূপ হইয়া বিরাজ করেন।

এতাদৃশী সর্ব্বগুণসম্পন্না শচীর প্রতিজ্ঞা অতি নিদারুণ! তিনি বসুন্ধরার ন্যায় বীরভোগ্যা। পুণ্যবলে যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করেন, শচী তাঁহারই হয়েন। সীতা ও সাবিত্রীর বিসদৃশী, শচী পদচ্যুত স্বামীর প্রতি আর ফিরিয়াও চান না।

শচীচরিত্রের এই অংশ তাদৃশ উপাদেয় বলিয়া বোধ না হইয়া, বরং যে ঋষি সীতা ও সাবিত্রীর দেশে, শচীর চরিত্র বাক্যে বিন্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহার সহৃদয়তার প্রতি, বা যে সময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হয়েন, সেই সময়ের দাম্পত্যধর্ম্মের প্রতি, দারুণ সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ সে প্রকার কিছুই নহে। শচী উপাখ্যানের মূল ঋগ্বেদে ; শচী শব্দের অর্থ যজ্ঞ ; ঋষিরা যজ্ঞ-কালে ইন্দ্রকে শচীপতি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। পরবর্ত্তী কবিরা যে ইহার উপরই পূর্ব্বোক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরন্তু আমরা এই অসাধারণ কবিত্বের প্রতি অন্ধ হইতে পারি না। এক পক্ষে কবি সমস্তই কল্পনা করিয়াছেন, অন্ত

পক্ষে কবি কিছুই কল্পনা করেন নাই। কবির সময়ে আর্য্যেরা জাহ্নবীতীরে বাস ও তথায় মহা-সমারোহে ঐন্দ্র যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেন। তাহা হইতেই মন্দাকিনী ও অমরাবতীর বর্ণনা হইয়াছে। যজ্ঞে অশেষ ফলপুষ্প ও অপরিমিত গব্যাদি দর্শনে, শচীর ভোগার্থে কল্পতরু ও কামদুঘার অবতারণা হইয়াছে। আর্য্যেরা যজ্ঞের দ্বারাই শত্রুদিগের ভীতি উৎপাদন করিতেন, তাহাও কল্পিত নহে। আবার তপোবলে ইন্দ্রত্বলাভ করিয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন, প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে এই স্পৃহাও সাতিশয় বলবতী ছিল।

স্বর্গ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্বর্গরাণী শচীকে কবি-কল্পনা বলিয়া, আশা করি, আমরা স্বর্গকে কবি-কল্পনা বলি নাই। পৌরাণিক কবিরা স্বর্গকে সমাজের ছায়ায় চিত্রিত করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত স্বর্গেও হিংসা দ্বেষ, জয় পরাজয়, ভোগ ও বিলাসিতার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে আর্য্য-দিগের সরল ও পবিত্র অন্তঃকরণে, স্বর্গের অতি মধুর নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ভাব উদিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে কথিত আছে,

"যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থা-পিত আছে, হে ক্ষরণশীল সোম! সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল।

"হে অন্তঃকরণ ! যিনি সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সুখের দেশে লইয়া যান, যাঁহার নিকট সকল লোকে গমন করে, তাঁহাকেই হোমের দ্রব্য দিয়া সেবা কর।

"আমরা স্বর্গস্বরূপ নৌকাতে আরোহণ করি; এই নৌকায় আরোহণ করিলে রক্ষার ভাবনা নাই। ইহা অতি বিস্তীর্ণ, সুন্দর, নিষ্পাপ ও অবিনাশী।

"তোমার এক অংশ অগ্নি, এক অংশ বায়ু, তৃতীয় অংশ জ্যোতির্ম্ময় আত্মাস্বরূপ; উহা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হউক, তুমি উত্তম স্বর্গে গমন কর।

"হে সোম ! আমরা তোমাকে পান করিয়া স্বর্গে যাইব, স্বর্গে যাইয়া অমর হইব। শত্রুরা আমাদের কি করিবে ?

"আমরা পিতৃলোকদিগের সহিত মিলিত হইব। তাঁহারা স্বর্গে আছেন। স্বর্গ অতি সুন্দর স্থান, নির্ম্মল ও চিরশান্তি-প্রদ; তথায় মৃত্যু নাই।"

স্বর্গই আর্য্য-জাতির পরম কাম্য পদার্থ, আজি পাঁচ সহস্র বৎসর তাঁহারা স্বর্গ-চিন্তায় নিমগ্ন। স্বর্গের জন্যই তাঁহারা বিষয়বিমুখ, বনবাসী ও তপঃক্লান্ত; স্বর্গের জন্যই তাঁহারা আত্মহারা। পৃথিবী তাঁহাদিগের নিকট পান্থ-নিবাস, স্বর্গ-পথের পাথেয় সংগ্রহ করিবার স্থানমাত্র।

ঋষিবংশ।

মহান্ ঋগ্বেদ শাস্ত্র দশমণ্ডলে বিভক্ত; ইহার প্রথম ও দশম মণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন সূক্তের অনেক ঋষি রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত এক এক মণ্ডল, এক এক জন ঋষি বা ঋষিবংশের বিরচিত। মহর্ষি গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডল রচনা করেন, বিশ্বামিত্র তৃতীয়, বামদেব চতুর্থ, অত্রি পঞ্চম, ভরদ্বাজ ষষ্ঠ, বসিষ্ঠ সপ্তম, কণ্ব অষ্টম এবং অঙ্গিরা নবম মণ্ডল প্রণয়ন করেন।

এই সমস্ত ঋষি বা ঋষিবংশের কতিপয় সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়; কেননা ইঁহাদের উপাসনা, ভাষা ও বাক্য-রচনাপ্রণালীতে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না, আবার কুত্রাপি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ও নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র বংশীয়দিগের পরস্পর বৈরিতা প্রবাদ-স্বরূপ। "হে ইন্দ্র! বিশ্বামিত্রগণ বসিষ্ঠগণের সহিত পার্থক্যই জানে, একতা জানেনা, তাহারা পরস্পর অশ্বপ্রেরণ করে, ও ধনুর্ধারণ করে।"

বসিষ্ঠগণের হস্তে বিশ্বামিত্র অশেষপ্রকারে নিগৃহীত হইয়া-ছিলেন। তথাপি বসিষ্ঠেরা বিশ্বামিত্রের সমকক্ষ হইতে পারেন না। বিশ্বামিত্র জ্ঞানে সমধিক উন্নত, জিতক্রোধ এবং মৌনাবলম্বী ঋষি ছিলেন। যখন বসিষ্ঠেরা তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া যান, তখন তিনি মৃদুমন্দস্বরে বলিয়াছিলেন, "হে জনগণ! তোমরা বিশ্বামিত্রকে জাননা! দেখ আমি তপঃ-ক্ষয়ের ভয়ে শাপ দানে নিবৃত্ত, তাই পশুবৎ লইয়া যাইতেছে!

বিদ্বান্ ব্যক্তি মূর্খের সহিত বিবাদ করে না, আমারও তোমা-দিগের সহিত বিবাদ করা উচিত নহে।"

পূর্ব্বোক্ত সুদাস রাজা বসিষ্ঠের ন্যায় বিশ্বামিত্রকেও পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র রাজযজ্ঞ সমাপন করিয়া যে রথে গৃহপ্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহা খদির ও শিশম্পা কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল, বলীবর্দ্দে উহা আকর্ষণ করিত। শিল্পকার্য্যের অসম্পূর্ণতা বশতঃই হউক, বা পথের বন্ধুরতা বশতঃই হউক, তাঁহার সময়ে রথে গমনাগমন বড় নিরাপদ ছিল, এরূপ বোধ হয় না।

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন ;—

'বনস্পতি অমাদিগকে ফেলিয়া দিওনা, আঘাত ও করিও না। আমাদের গৃহগমন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক ; রথবেগের অবসান ও পশুর বিমোচন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক।'

বিশ্বামিত্রের সময়ে অনার্য্য-জাতিরা যে বিতাড়িত হইয়া অতি দূরবর্ত্তী ভূভাগ আশ্রয় করে, নিম্নলিখিত ঋকে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"কীকট সমূহের মধ্যে যে সকল গাভী আছে, তাহারা তোমার কি উপকারে আসিবে ? উহারা সোমের সহিত মিশ্রিত হইবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না ; বরং হে মঘবন্ ! আমাদের নিকট প্রমগন্দের ধন আনয়ন কর, নীচ-বংশীয়দিগের ধন আমাদের হউক।" প্রাচীন-কালে মগধদেশবাসীরা কীকট নামে অভিহিত হইত, এবং প্রমগন্দ উহাদিগের রাজা ছিলেন।

পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই প্রদেশে অনার্য্যদর্প বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত খর্ব্বীকৃত হয় নাই ; পরন্তু, ইহারা বৌদ্ধ পতাকা উড্ডীন

করিয়া একদিন আর্য্যতেজঃকেও মলিনীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিশ্বামিত্র ফলমূলাহারী বনবাসী ঋষি ছিলেন না। বোধ হয়, তখনও ঋষিদিগের বনবাসপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তিনি সংসারাশ্রমে পুত্রকলত্রগণের সহিত বাস করিতেন। যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শিতা থাকাতে তিনি প্রথমে রাজা হয়েন; কিন্তু অনতিবিলম্বেই পরমার্থচিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া তপস্যাচরণ ও অশেষবিধ যজ্ঞ সমাপন করেন। তিনি প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে তপোবলে ব্রাহ্মণ হয়েন, বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহার বোধ হয় এই কারণ।

মহর্ষি বসিষ্ঠ যে সকল সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন, নিম্নে তাহার কতিপয় উদ্ধৃত হইল।

'বিদ্বান্‌গণের বিদিত হউক, যে সত্য এবং অসত্য বাক্য পরস্পর স্পর্দ্ধা করে; যাহা সত্য এবং ঋজু, সোম তাহাকেই পালন করেন, অসত্যকে হিংসা করেন।

'দেবতারা পাপকারীকে প্রবর্ত্তিত করেন না; বলবান্ মিথ্যাবাদী পুরুষকেও প্রবর্ত্তিত করেন না। তাঁহারা কেবল সত্যকেই রক্ষা করেন।

"পুত্র যেমন পিতাকে আহ্বান করে, আমিও সেইরূপ ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। যে ব্যক্তি সৎকর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, সে অনেক প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।"

বসিষ্ঠের সময়ে নৌকাযোগে সমুদ্রগমনের রীতি ছিল। একদা তিনি স্বয়ং সমুদ্র গমন করিয়া, সিন্ধুতরঙ্গে দোলায়মান তরণীতে, দোলারোহণের আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

যৎকালে বসিষ্ঠগণ সুদাসের যজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বয়ন্তের পুত্র পাশত্যুম্ন নামক রাজাও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। কথিত আছে, বসিষ্ঠেরা মন্ত্রবলে ইন্দ্রকে, শেষোক্ত যজ্ঞ পরিত্যাগ করাইয়া, সুদাসের যজ্ঞে আনয়ন করেন। ইঁহারা যে বিশুদ্ধ মন্ত্রবান্ ও যজ্ঞ সম্পাদনে সুনিপুণ ছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত ঋকেও তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

"হে বসিষ্ঠগণ! তোমাদিগের স্তোম সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হয়। তোমাদিগের স্তোম বায়ুবেগের ন্যায় অন্যের অনুগমনের অশক্য। তোমাদের মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর।"

বসিষ্ঠ বংশীয়েরা শ্বেতকায়, দেখিতে অতি সুন্দর, কর্ম্মিষ্ঠ ও সর্ব্বজনপ্রিয় পুরোহিত ছিলেন। তাঁহারা মস্তকের দক্ষিণ-ভাগে চূড়া ধারণ করিতেন।

গৃৎসমদ।

যাঁহারা স্থিরভাবে মানবপ্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে মনুষ্যেরা চিরকাল এক বিষয়ে এক ভাবে লিপ্ত থাকিতে পারে না। পরিবর্ত্তন ও নবীনতার জন্য মনুষ্য সততই ব্যগ্র। ধর্ম্মের ইতিবৃত্তেও, মনুষ্যেরা চির

দিন একভাবে উপাসনা করে নাই, বা আরাধ্য বস্তুকে এক ভাবে ভাবনা করে নাই; শীঘ্র বা বিলম্বে অবশ্যই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

এই ভাবান্তর কখনও সহজে সংসাধিত হয়; কখনও বা ইহার প্রাক্‌কালে লোকের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়া জাতীয় সমিতিকে বিব্রত করিয়া ফেলে।

যে সকল মহাপুরুষেরা এই সন্দেহের নিরাকরণপূর্ব্বক ভাবান্তর সংস্থাপন করিয়া দেন, তাঁহাদিগকেই আমরা ভক্ত, এবং অলৌকিক-ক্ষমতা-সম্পন্ন হইলে অবতার, বলিয়া পূজা করি। মহর্ষি গৃৎসমদ এইরূপ একজন ভক্ত ছিলেন।

বৈদিক সময়ের কোন ভাগে যখন লোকের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা 'ইন্দ্র কোথায়, কে তাঁহাকে দেখিয়াছে?' এই প্রকার প্রশ্ন করিতেছিল, সেই সময়ে গৃৎসমদ প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি অঙ্গিরাবংশোদ্ভব শুনহোত্রের পুত্র।

অঙ্গিরাকুলে ইন্দ্রের উপাসনা ছিল না বলিয়া, গৃৎসমদ বংশ ত্যাগ করিয়া ভৃগুবংশে যোগদান করেন। নিম্নলিখিত ঋক্‌সমূহ পাঠ করিলে, তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

"হে মনুষ্যগণ! যে ভয়ঙ্কর দেবসম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়, এবং যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলে যে তিনি নাই, তাঁহাতেই বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র।

হে মনুষ্যগণ! দুইদল সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যে একজনকে আহ্বান করে, বিশ্বাস কর তিনিই ইন্দ্র।

যিনি না হইলে লোকে জয়লাভ করিতে পারে না, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিনিধি ও অক্ষয়, তিনিই ইন্দ্র।

যিনি অপূজকদিগকে বজ্রদ্বারা বিনাশ করেন, গর্ব্বিত মনুষ্য যাঁহার নিকট সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, হে মনুষ্যগণ! বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র।

যিনি সূর্য্য ও উষাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পর্ব্বত সমূহকে নিয়মিত করিয়া পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ যাঁহার রচনা, দ্যুলোক যাঁহার ভয়ে স্তম্ভিত, হে মনুষ্যগণ! বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র।"

এই সময়ে ধুনি ও চুমুরি নামক দুইজন ভয়ঙ্কর দস্যু আর্য্যসমাজে বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা নগর-অবরোধপূর্ব্বক অধিবাসীদিগকে অশেষবিধ কষ্টে নিপাতিত করিত। কথিত আছে, তাহারা গৃৎসমদের যজ্ঞশালায় উপনীত হইয়া, তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। জ্ঞাননিষ্ঠ ঋষি যোগবলে নিস্তার লাভ করেন। ধুনি ও চুমুরি রাজর্ষি দভীতির পুরী লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

গৃৎসমদ স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা, স্বর্ণালঙ্কার, ক্ষোণী ও কর্করি নামক বীণা ও বাদ্যযন্ত্রবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সময়ে আর্য্যদিগের সামাজিক অবস্থা তাদৃশ হীন ছিল না।

অঙ্গিরা।

পুরাকালে ঋষিরা সোমরস পান করিতেন। সোম পর্ব্বতাদিতে উৎপন্ন লতাবিশেষ। উহা যজ্ঞস্থলে প্রস্তরে নিষ্পীড়িত হইলে, রমণীরা অঙ্গুলী দ্বারা চটকাইয়া উহার রস বাহির করিতেন। ঐ রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেষ-লোম-নির্ম্মিত ছাকনি দ্বারা ছাকা হইত। পরে ঋষিরা তাহা দুগ্ধ বা ক্ষীর সহযোগে পান করিতেন।

সোমপানে, বল উৎসাহ, চিত্তসংযম ও মনের একাগ্রতা, সাধিত হইত বলিয়া, ঋষিরা পরমার্থ সাধনের হেতুভূত সোমের পূজা করিতেন। অঙ্গিরা বংশোদ্ভব ঋষিরা সোমস্তুতির জন্যই বিখ্যাত।

কেহ কেহ মনে করেন,—ঋষিরা সোমপানে চন্দ্রকিরণের ন্যায় বিমল ও পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতেন,—এই সৌসা-দৃশ্যবশতঃ চন্দ্রও সোমনামে অভিহিত হইয়াছেন।

অঙ্গিরাবংশ, মনু ও ভৃগু বংশের ন্যায়, অতি প্রাচীন। অনুমান করা যাইতে পারে, যে সময়ে আর্য্যেরা সর্ব্বপ্রথমে ভারত আশ্রয় করেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালেই ইহারা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা আগ্নেয় যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কিন্তু অঙ্গিরাগণের সমধিক যত্ন ও অনুরাগ সত্ত্বেও, ভারতে সোমপানপ্রথা চিরস্থায়িনী হইতে পারে নাই। সোম শীত-প্রধান দেশের সামগ্রী। ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে

আর্য্যেরা ইহাতে বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন। ইরানীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও, হাওমা নামে সোমের ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন আর্য্যগণ ভারতের শীতপ্রধান ভাগে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের মধ্যেও, সোমপানের বিলক্ষণ প্রচলন ছিল। অঙ্গিরাগণও যথা তথা পরম সমাদরে পূজিত হইতেন। কালসহকারে আর্য্যগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভূভাগে বিস্তৃত হইলে, নৈসর্গিক তাপের আধিক্য-বশতঃ, সোমব্যবহার ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বামদেব।

যে সময়ে আর্য্যগণ সরযু অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন, আর্য্যরাজগণের মধ্যেও পরস্পর যুদ্ধ বাধিয়াছে, সরযুর পূর্ব্ব-পারে অর্ণ ও চিত্ররথ নামক দুইজন পরাক্রান্ত আর্য্যভূপতি সমরে নিহত হইয়াছেন, সেই সময়ে মহর্ষি বামদেব প্রাদুর্ভূত হয়েন।

বামদেব একস্থানে বলিয়াছেন, 'হে ইন্দ্র! তুমি দভীতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎ সহস্র দস্যু বিনাশ করিয়াছিলে।' এখন দভীতি যে গৃৎসদের সমসাময়িক, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কেন না যে সকল দস্যু দভীতির পুরী লুণ্ঠন করে, তাহারা গৃৎসমদকেও বধ করিতে উদ্যুক্ত ছিল।' অতএব বামদেব গৃৎসমদের পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

বামদেব ত্রসদস্যু নামক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি পুরুকুৎসের পুত্র এবং অতীব বলবীর্য্য সম্পন্ন আর্য্যভূপতি। ইঁহার শৈশবাবস্থায় যখন পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হয়েন, সাত জন ঋষি রাজ্যের অরাজকতা নিবারণ করিয়াছিলেন। ত্রসদস্যু যৌবনে পদার্পণ করিয়া অনার্য্যজাতির ত্রাস স্বরূপ হইয়া উঠেন। তিনি অতি জ্ঞানবান্ যশস্বী ও দাতা ছিলেন। দুইশত দশটী ধেনু তদীয় বিস্তৃত রাজপরিবারের জন্য দুগ্ধদান করিত।

মহর্ষি বামদেবের রচনা অতি সুন্দর ও গভীরধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহার রচিত একটী ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'হে সবিতৃদেব! আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ, প্রমাদ বা ধন-জনগর্ব্ববশতঃ, দেব ও মনুষ্যের প্রতি যে অপরাধ করিয়াছি, তুমি তাহা মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে পুনরায় নিষ্পাপ কর।'

'দ্রুতগামী শ্যেনপক্ষী অন্তরীক্ষে উৎপতিত হইয়া আমাদের জন্য অমৃত আনয়ন করেন,' বামদেব অনেক স্থলেই এই কথা বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়ণাচার্য্য বলেন, "যে বামদেব ঋষি যতদিন শরীর ও আত্মার বিভিন্নতা না জানিতেন, ততদিন নিরুদ্ধ ছিলেন, পরে আত্মাকে অনাবৃত জানিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় নির্গত হইলেন।" আত্মার বুদ্ধ মুক্ত অবস্থাতেই তাঁহার আনন্দামৃতলাভ হইল।

ধর্ম্মের ইতিবৃত্তে কোন মহাত্মা কি করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। যদি বাস্তবিক বামদেবই সর্ব্বপ্রথমে আত্মার বুদ্ধমুক্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, তবে তিনিই যে

ধর্ম্মজগতের মহোপকারসাধন করিয়া গিয়াছেন, কে অস্বীকার করিবে ?

অত্রি।

মহর্ষি অত্রি অধিক সূক্তের প্রণেতা নহেন। তদীয় সূক্ত গুলিও উপাসনাত্মক। একটী স্থানে কেবল ত্র্যরুণ নামক রাজর্ষি ও ত্রসদস্যু রাজার উল্লেখ আছে। "সাধুগণের রক্ষক ধনবান্ ত্র্যরুণ আমাকে শত সুবর্ণ, বিংশতি গো, এবং শকটবহনক্ষম অশ্বযুগ প্রদান করিয়াছেন। ত্রসদস্যুও অগ্নির স্তব করিতে অভিলাষী হইয়া, আমাকে দান করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন।" অতএব অত্রি বামদেবের পরবর্ত্তী নহেন।

তদ্বংশীয় শ্যাবাশ্ব ঋষি রথবীতি নামক রাজার বর্ণনা করিয়াছেন। "এই ঐশ্বর্য্যশালী রথবীতি গোমতী-তীরে বাস করেন। পর্ব্বতের প্রান্তভাগে তাঁহার গৃহ অবস্থিত আছে।" বোধহয়, অযোধ্যার অন্তর্গত গোমতী নদী যে স্থানে হিমালয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, সেই স্থানেই রথবীতির রাজধানী ছিল।

শ্যাবাশ্ব আর একজন আর্য্য ভূপতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার নাম তরন্ত। তদীয় মহিষী শশীয়সী, শ্যাবাশ্বের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে অনেক পশু ও ধনদান করত, নিজ অনুজ পুরুমীঢ়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ঋষি বলিতেছেন,

'তদ্দত্ত দুইটী লোহিত-বর্ণ অশ্ব আমাকে যশস্বী ও বিজ্ঞ পুরুমীঢ়ের নিকট বহন করিয়াছিল। বিদদশ্বের পুত্র পুরুমীঢ় আমাকে ধেনুশত, ও তরন্তের ন্যায় অনেক মহামূল্য ধন, প্রদান করিয়াছিলেন।'

মহাত্মা অত্রি সূর্য্যসম্বন্ধে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদিগের অপেক্ষা অধিকতর চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সূর্য্যগ্রহণসম্বন্ধীয় সূক্তপাঠে প্রতীতি হয়, যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্যগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করেন।

অনন্তর তদ্বংশীয় ঋষিরাও সেই চিন্তাশীলতার ভাগী হইলেন। তাঁহারা উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি, তাহাকে সবিতা, এবং উদয় হইতে অস্তগমন পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি, তাহাকেই সূর্য্য নামে অভিহিত করিলেন। সবিতৃদেবের উপাসনার্থে কতিপয়সূক্তও প্রণীত হইল।

শ্রুতবিদ কহিলেন, 'আমি সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করিয়াছি; সেই স্থানে সহস্রসংখ্যক রশ্মি সমবেত হইয়া অবস্থিতি করে। দেবমূর্ত্তি-সমূহের মধ্যে সেই এক শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি আমার নয়নগোচর হইয়াছে।

'ফলতঃ এই মাহাত্ম্য অতি প্রশস্ত, যদ্দ্বারা নিরন্তর পরিভ্রমণকারী সূর্য্য, দৈনিক গতির সাহায্যে, বদ্ধ জলরাশিকে দোহন করিতেছেন।"

এইরূপ চিন্তা সকল উদিত হইতে লাগিল। দারুণ দেব-বুদ্ধি ও অসামান্য ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধিৎসার স্রোতঃ প্রবাহিত হইল; অন্তরে অন্তরে সৌর প্রকৃতির পর্য্যালোচনা

হইতে লাগিল। অবশেষে অত্রিকুলতিলক প্রতিরথ যে বাক্য উচ্চারণ করিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানও তদপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে সমর্থ নহেন।

"হে ঋত্বিক্‌গণ! এই সম্মুখস্থিত সূর্য্যমণ্ডল অতিশয় স্তবার্হ; ইহা হইতেই নদী সকল প্রবাহিত হয়, এবং ইহাতেই বারি-রাশি অবস্থান করে। দিবা ও রাত্রি ইহা হইতেই উৎপন্ন, ইনিই ঋতু গণকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।"

ভরদ্বাজ।

আমরা যখন ঋষিদিগের বিষয় পর্য্যালোচনা করি, তখন তাঁহারা কোন্ সময়ে এবং কোন্ স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য কতই উৎসুক হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা জানিবার অতি অল্পই উপায় বিদ্যমান আছে। প্রাচীন গ্রন্থমাত্রেই উপাসনাত্মক; উহা ঋষিদিগের পবিত্রতা, সৎকর্ম্ম-নিষ্ঠা, এবং ঈশ্বরপরায়ণতার যত পরিচায়ক, ঐতিহাসিক তৃষ্ণার তত নিবৃত্তিকারক নহে।

বিশেষতঃ ভরদ্বাজ ইতর বিষয়ের অধিক উল্লেখ করেন নাই। তিনি যে একটী মাত্র যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উপলব্ধি হওয়াও দুর্ঘট।

'হরিযুপীয়া নদীর পূর্ব্বকূল আশ্রয় করিয়া বৃচীবানের বংশধরেরা বাস করিত। অভ্যবর্ত্তী নামক রাজা তিন সহস্র বর্ম্ম ধারীর সহিত উহাদিগকে বিনাশ করেন। ইনি আমাকে অনেক ধন ও গবাদি পশু দান করিয়াছিলেন।

এখন অভ্যবর্ত্তী কে? বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত, দেবরাতের পুত্র চয়মান, চয়মানের পুত্র অভ্যবর্ত্তী। বসিষ্ঠ বা তাঁহার অপত্যগণ সুদাসের তুলনায় ইহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। অতএব ভরদ্বাজ বসিষ্ঠদিগের সময়ে জীবিত ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

অনন্তর হরিযুপীয়া নদী কোথায় ছিল, আমরা তাহা অবগত নহি। বৃচীবানের বংশধরেরাই বা কে, আর্য্য কি অনার্য্য তাহারও স্থিরতা নাই। তবে উহারা অনিন্দ্রবাদী ছিল বলিয়া বোধ হয়।

এই মহর্ষি সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যাউক বা না যাউক, ইঁহার পৌরহিত্য যে একটী অতি মহৎ কর্ম্মের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে গোবধ-নিবারণের চেষ্টা পান। জীবকারুণ্যশালী মহর্ষি এই সম্বন্ধে যে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"হে ধেনুগণ! তোমরা আমাদিগকে পোষণ কর; তোমরা ক্ষীণ ও কুৎসিত দেহকে শ্রীযুক্ত কর। তোমরাই আমাদের গৃহের সমৃদ্ধি।

"ধেনুগণ যেন বিনষ্ট না হয়। তস্করগণ যেন তাহাদিগকে অপহরণ না করে। শত্রুর অস্ত্র যেন তাহাদের অঙ্গে নিপতিত না হয়। তাহারা যজ্ঞে বলিদানাদি সংস্কার ও প্রাপ্ত না হউক। হে মনুষ্যগণ! এই সমস্ত ধেনুগণই সেই ইন্দ্র, যাঁহাকে আমি মনঃ ও প্রাণের সহিত কামনা করি।"

কণ্ব।

যে সকল ঋষিরা কোন রাজা বা যুদ্ধ, নদী বা পর্ব্বত, দেশ বা ঘটনাবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাচীনতার গাঢ় অন্ধকারে তাঁহারাই আমাদিগের আলোকস্বরূপ। কিন্তু তাদৃশ ঋষির সংখ্যা অধিক নহে। অনেকেই যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক তত্তৎবিষয়ের পরিহার করিয়াছেন। হয় ত, তাঁহারাই জ্ঞানে সমধিক উন্নত, নিঃস্পৃহ, এবং ধর্ম্মেতরবাক্যোচ্চারণে বিরত, যৎকালে অপরেরা বিষয়ী, রাজপ্রসাদপ্রার্থী এবং কবিত্বোপজীবী ছিলেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণের নিকট কেবল পারত্রিকের জন্য, এবং শেষোক্তদিগের নিকট, ঐহিক পারত্রিক এই উভয়ের জন্য, কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিয়াছি।

মহাত্মা কণ্ব কতিপয় উপাসনাবাক্য ব্যতীত আমাদিগের জন্য আর কিছুই রাখিয়া যান নাই। কিন্তু যে সকল পুত্ররত্নে তাঁহার গৃহ অলঙ্কৃত ছিল, তন্মধ্যে সোভরি মেধাতিথি ও প্রগাথ, পৌরহিত্য ও কবিত্ব, উভয়গুণেই ভূষিত ছিলেন। প্রগাথ আর্জীকিয়া নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই নদী পরবর্ত্তীকালে বিপাশা নামে অভিহিত হব, এক্ষণে ইহার নাম বেয়া। প্রগাথ ঐ প্রদেশে অত্যুগ্র সোমরস ব্যবহারের বিষয় অবগত ছিলেন।

মেধাতিথি পঞ্চজনের কথা বলিয়াছেন। সিন্ধুর পঞ্চশাখার তীরস্থিত পঞ্চ প্রদেশই ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। মেধাতিথি 'ঐ প্রদেশ ইন্দ্রের অনুপযুক্ত' বোধে, যজ্ঞস্থলে প্রর্থনা করিতেছেন, "ইন্দ্র দূরদেশ হইতে পঞ্চজনকে অতিক্রম করিয়া আমাদের নিকটে আগমন করুন।"

মেধাতিথি বোধ হয় সরস্বতীতীরে বাস করিতেন। পঞ্জাব আর্য্যজাতির প্রাচীন বাসস্থান ছিল; তৎপরে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই আর্য্যনিবাসের প্রকৃষ্টতর স্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ব্রহ্মাবর্ত্তেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। মেধাতিথির সময়ে, ব্রহ্মাবর্ত্তের ধনজনবাহুল্য সোভরির দ্বারা প্রতিপাদিত হইতে পারে।

কণ্বপুত্র সোভরি ত্রসদস্যু রাজার ভবনে প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি অত্রির সমসাময়িক ছিলেন। কথিত আছে, পুরুকুৎস তনয় ত্রসদস্যু তাঁহাকে আত্মরক্ষার্থ পঞ্চাশ জন বধূ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সরস্বতীতীরে চিত্র নামক রাজা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সোভরি তাহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, সেই যজ্ঞে সরস্বতীতীরবাসী যাবতীয় আর্য্যভূপতি নিমন্ত্রিত, ও ধনরত্নসহকারে অর্চ্চিত হইয়াছিলেন।

যদিও আর্য্যবিজয়স্রোতঃ ইতিপূর্ব্বেই যমুনাতট অতিক্রম করিয়াছিল, তথাপি বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মাবর্ত্তই মহতী আর্য্য-সমিতির কেন্দ্রভূত বলিয়া বিবেচনা হয়। পরাক্রান্ত বীরপুরুষেরা পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী সমরাঙ্গনে দাসের যে ধনরত্ন লাভ করেন, তৎসমস্তই অবিলম্বে ব্রহ্মাবর্ত্ত নিবাসে বাহিত, ও তথাকার পরিশোভার্থে কল্পিত, হয়। সরস্বতী তীরে লোকারণ্য দেখিয়া দূরদর্শী ঋষি-দিগের অন্তঃকরণে এক অভিনব চিন্তার উদয় হয়। তাঁহারা দেবনদীকে সম্ভাষণ করিয়া বলেন, 'সরস্বতি! আমরা যেন তোমার নিকট হইতে কোন অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি

আপেক্ষিক প্রাচীনতা।

যে আটজন ঋষির বিষয় বর্ণিত হইল, তাঁহাদের মধ্যে অঙ্গিরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সায়ণাচার্য্যের মতে গৃৎসমদ, অবশিষ্ট ঋষিদিগের মধ্যে প্রাচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন। কিন্তু পণ্ডিতবর রমেশচন্দ্র দত্ত অনুমান করেন, গৃৎসমদ বৈদিক সময়ের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

অবশিষ্ট ছয়জনের মধ্যে, বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ এই তিন জনকে সমসাময়িক বলা যাইতে পারে; কেননা বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়েই সুদাসের যজ্ঞভবন চরিতার্থ করেন, এবং ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্রের প্রপৌত্র অভ্যাবর্ত্তীর দানগ্রহণ করেন। বিশ্বামিত্র তপোবলে দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন; অভ্যবর্ত্তীর সময়ে তাঁহার জীবিত থাকা অসম্ভাবিত নহে।

অত্রি ও কণ্বপুত্র সোভরি উভয়েই ত্রসদস্যুর সময়ে জীবিত ছিলেন। বামদেব যে ত্রসদস্যুর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতীত বৃত্তান্তের উল্লেখ বলিয়াই বোধ হয়। বামদেব, অত্রি ও কণ্বের পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

এখন সুদাস ও ত্রসদস্যু এই উভয়ের প্রাচীনতার তুলনা করা আবশ্যক। তাহা হইলে ঋষিদিগের আপেক্ষিক প্রাচীনতার উপলব্ধি হইতে পারিবেক।

সুদাস রাজা কোন্ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন? বিশ্বামিত্র সুদাসের যজ্ঞ সমাপন করিয়া গৃহগমনসময়ে, শতদ্রু ও বিপাশা নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র যে

ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ঋষি ছিলেন, তৎপুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষির প্রণীত সরস্বতীস্তোত্রই তাহার উত্তম প্রমাণ। সিন্ধুতীরবাসী হইলে, ঋষি সরস্বতীর নিকট, জলদানের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন কেন? সুদাসের রাজধানী বিপাশার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত না হইলে, বিশ্বামিত্র গৃহপ্রত্যাগমনকালে বিপা-শার তীরে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। পণ্ডিতকুলতিলক মোক্ষমূলরও বলেন, যে নদীতে সুদাসকে নষ্ট করিবার জন্ত অনার্য্য রাজগণ ষড়যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিল, সে ইরাবতী, তাহার আধুনিক নাম রাবী; সুতরাং সুদাস পঞ্জাব প্রদেশের অধিপতি ছিলেন।

অনন্তর, ত্রসদস্যুসম্বন্ধে পঞ্চনদীর কোন উল্লেখ নাই। তিনি যে অত্রির সময়ে জীবিত ছিলেন, সেই অত্রিপুত্র শ্যাবাশ্ব, অযোধ্যার অন্তর্গত গোমতী পর্য্যন্ত প্রদেশের বর্ণনা করিয়াছেন। হয় ত এই রাজ্য বিস্তার ত্রসদস্যুর দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকিবে। তিনি যে অতি পরাক্রান্ত বীর ও বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে ঋষিরা সকলেই একবাক্য; এমন কি কেহ কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিনাশক এবং অর্দ্ধদেব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এতাদৃশ বীরপ্রকৃতিসম্পন্ন ত্রসদস্যু কোন্ প্রদেশে বাস করিতেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বোধ হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিবিরসন্নিবেশন-পূর্ব্বক দস্যুদমনই তাঁহার কার্য্য-ছিল। তিনি মহর্ষি অত্রির দ্বারা আগ্নেয় যজ্ঞসম্পাদনের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। অত্রি যমুনার সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেন। তৎপুত্র শ্যাবাশ্ব ঋষির মুখেই আমরা যমুনা-

তীরের প্রসিদ্ধ ধেনুধনের কথা শুনিতে পাই। ইহাতে বোধ হয়, ত্রসদস্যু নানা শিবিরে সামরিক জীবন শেষ করিয়া চরমে ঐ প্রদেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

ইনি যে সুদাসের পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধ হয়েন, ইঁহার সময়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত অতিক্রম করিয়া যমুনা ও গোমতী পর্য্যন্ত আর্য্যরাজত্বের বিস্তারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সময়ে আর্য্য-সমাজে স্বর্ণালঙ্কার, নিষ্কনামক স্বুবর্ণমুদ্রা, এবং হিরণ্ময় মস্তকাভরণের প্রচলন হইয়াছিল। যুদ্ধার্থে বর্শা, খড়্গা, ধনু, ইষু ও বর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রেরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সুদাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে ভরদ্বাজ-পুত্র পায়ু ঋষি, তীর ধনু ও বর্ম্ম ভিন্ন, অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্রের নাম করিতে পারেন নাই। বসিষ্ঠও যে স্বুবর্ণমুদ্রা দেখিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন নাই।

উল্লিখিত বিষয়ের সমর্থনার্থে একটী বেদবাক্যও উদ্ধৃত হইতে পারে। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি বলিতেছেন,

'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যেমন রথোপরি ধন ও অন্ন আনিয়া সুদাসকে দান করিয়াছিলে, সেইরূপ দ্যুলোক হইতে আমাদিগকেও ধন দান কর।'

ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সুদাস প্রস্কণ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী। এবং আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ত্রসদস্যু কণ্বের অন্যতম পুত্র সোভরির সমসাময়িক। অতএব সুদাস ত্রসদস্যুর পূর্ব্ববর্ত্তীই ছিলেন, এবং অত্রি প্রভৃতি ঋষিরা বসিষ্ঠাদির পরবর্ত্তী কালেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পৌরাণিক মত।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে ঋষি ও রাজাদিগের প্রাচীনতার যে তুলনা করা গিয়াছে, পৌরাণিকমতের সহিত উহার ঐক্য দেখিলে আমাদিগের কতই আনন্দ হয়! পৌরাণিকেরা বলেন, ইক্ষাকু ও বুধ, ক্রমশঃ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ ছিলেন। ইঁহারা এক সময়েই রাজ্য আরম্ভ করেন। আমরা বৈদিকসময়ে ইঁহাদিগকে পঞ্জাবে আধিপত্য করিতে দেখিতে পাই। কথিত আছে, "ইক্ষাকু রাজা যে প্রদেশের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেই পঞ্চজন পদের লোকেরা যেন স্বর্গসুখ ভোগ করে।"

পুরাণে যযাতি চন্দ্রবংশের পঞ্চম রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। বৈদিক ঋষিরা বলেন, ইঁহার পুত্র অনু ও তুর্ব্বশু প্রভৃতির সহিত সুদাসের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা হইলে সুদাস, ঐ বংশীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম রাজার সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

এখন যদি পৌরাণিকেরা বলেন, ত্রসদস্যু সূর্য্যবংশীয় বিংশতিতম নৃপতি ছিলেন, তাহা হইলে বেদে ও পুরাণে কিছুমাত্র বিরোধ ঘটিতেছেনা; কেননা আমরা পূর্ব্বে বেদবাক্যের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, সুদাস ত্রসদস্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন; কিন্তু কত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা বলিতে পারি নাই।

এক্ষণে, যাঁহারা পুরাণোক্ত রাজশ্রেণীকে কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি উপরোক্ত ঐক্যদর্শনে কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়েন, আমরা পুরাণের সাহায্যে রাজা ও ঋষিদিগের সময়নির্দ্ধারণে অগ্রসর হই।

পৌরাণিকেরা বলেন, ইক্ষাকুকে লইয়া পঞ্চান্ন জন রাজার পর রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

যে স্থানে জ্যেষ্ঠপুত্রপরম্পরার রাজ্যাভিষেকের রীতি আছে, পণ্ডিতেরা তথায় প্রত্যেক রাজত্বকাল গড়ে ত্রিশ বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। তদনুসারে রামচন্দ্র ইক্ষাকুর ১৬৫০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে, খৃষ্টের প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, রামচন্দ্র জীবিত ছিলেন। অতএব স্থূলভাবে, রামচন্দ্রের সময় বর্ত্তমান সময়ের ২৯০০ শত, এবং ইক্ষাকুর সময় ৪৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে, ধরা যায়।

উপরোক্ত নিয়মানুসারে সুদাস ও বসিষ্ঠাদি ঋষি, ইক্ষাকুর দুইশত বৎসর পরে, এবং ত্রসদস্যু ও কণ্ব প্রভৃতি ঋষি, ইক্ষাকুর ছয়শত বৎসর পরে, প্রসিদ্ধ হয়েন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বসিষ্ঠের সময় হইতে অত্রি ও কণ্বের সময় পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির সামাজিক ও সামরিক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে, তিন চারিশত বৎসরের কমে তাহার ঘটনা হওয়া দুষ্কর।

এখন যদি পুরাণোক্ত আর একটী বিষয়ের সহিত, বেদের ঐক্য-বিধান করা যায়, তাহা হইলে আমরা পুরাণের প্রতি আরও নির্ভর করিবার পথ পাই। সে বিষয়টী তত গুরুতর নহে, একটী রাজার উপাখ্যান মাত্র। দুই সহস্র বৎসর নৈশ রঙ্গভূমিতে অভিনীত, নানাগুণে বিভূষিত, সর্ব্বত্র সমাদৃত, কিন্তু কবিকল্পনা বলিয়া সাধারণতঃ উপেক্ষিত; আমি দুষ্মন্তের উপাখ্যান অভিপ্রায় করিতেছি। কণ্ব ত্রসদস্যুর সময়ে জীবিত ছিলেন, ইহা বেদবাক্য; দুষ্মন্ত কণ্বের পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ

করিয়াছিলেন, ইহা পুরাণপ্রসঙ্গ। এখন যদি আমরা বৃহৎ রাজতালিকা খুলিয়া ত্রসদস্যু ও দুষ্মন্তকে সমসাময়িক বলিয়া দেখিতে পাই, তাহা হইলে কি আমরা মনে করিব, যে দুষ্মন্তের উপাখ্যানের সহিত ঋগ্বেদের মিল রাখিবার জন্য, পৌরাণিকেরা তাঁহাকে চন্দ্রবংশের বিংশতিতম রাজা বলিয়া, ত্রসদস্যুর সমসাময়িক করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন? ঐ সকল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোকের দ্বারা প্রণীত হইয়াছে। ব্যক্তি বিশেষের চক্রান্তে উহাদের ঐক্য বিধান হইয়াছে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

ত্রসদস্যুকে লইয়া সাতজন রাজার পরে হরিশ্চন্দ্র প্রাদুর্ভূত হয়েন। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে, এই উভয়ের কাল-ব্যবধান প্রায় দুই শত বৎসর ধরা যায়। নরবলিপ্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্রের কথা আছে। অতএব ইক্ষাকু হইতে ৮০০ শত বৎসরের পরবর্ত্তী কোন সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল, অপিচ এতাবৎ কাল বৈদিক সময়েরই অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়।

মহাত্মা সগর হরিশ্চন্দ্র হইতে দশম রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তদীয় প্রপৌত্র ভগীরথ, শতকোটী হিন্দুর পরিত্রাণার্থে, ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাকে মর্ত্ত্যধামে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই আমরা পুণ্যসলিলা ভাগীরথীকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব হরিশ্চন্দ্র হইতে ৪০০ শত বৎসরের মধ্যেই বঙ্গভূমিতে আর্য্য-রবির উদয় হইয়া থাকিবে। যখন রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইলেন, তখন বঙ্গবাসী ৪০০ শত বৎসরের অধিক-কাল অযোধ্যার মহিমা অবগত হইয়াছে।

অবশিষ্ট ঋষি।

অসংখ্য-নক্ষত্র-বিরাজিত নৈশ গগনের ন্যায়, ভারতের বৈদিক আকাশ অসংখ্য-ঋষিসমূহে পরিশোভিত; জ্যোতিষ্কগণ দূর হইতে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু যদি আমরা কোন ক্রমে ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম যে, উহাদের এক একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতসদৃশ। ভারতীয় ঋষিদিগের সম্বন্ধেও এইরূপ।

যে সমস্ত ঋষির কথা বিবৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আরও শত শত ঋষি পূর্ব্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বৃহস্পতি, কশ্যপ, অগস্ত্য এবং নারদ প্রভৃতি ঋষির নাম আমরা সকলেই অবগত আছি। চারি সহস্র বৎসরের গাঢ় অন্ধকারও ঐ সকল মহাত্মার নাম-লোপ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনন্তর তাঁহাদের বিষয় যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থ শেষ করিব।

অনেকে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, যে এই গ্রন্থে কেবল ঋষিদিগের কথা বিবৃত হইল, বৈদিক সময়ের রাজাদিগের বিষয় বর্ণিত হইল না কেন? কিন্তু ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন নাই; যে দুইটী রাজার উল্লেখ করা গিয়াছে, উঁহারাই আদর্শরূপে গৃহীত হউন। প্রাচীন রাজাদিগের মধ্যে, চেষ্টা বা চিন্তা, ইহার কিছুরই পার্থক্য অনুভব করা যায় না। সকলেই দস্যু দমন, ধনাহরণ ও স্ব স্ব অধিকার বর্দ্ধনে সমুৎসুক; তথাপি, সিন্ধু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত, স্বল্পায়তভূভাগে অসংখ্য অসংখ্য

রাজা বিদ্যমান থাকাতে, অনেকে শত বর্গ মাইল পরিমিত স্থানেরও অধিকারী হইতে পারেন নাই। আবার কেহ কেহ, কয়েক শত ধেনু মাত্রের অধিকারী হইয়াই, রাজা নামে অভি-হিত হইয়া গিয়াছেন।

ইঁহাদের অনেকেই ইষ্টকালয়ে বাস করেন নাই। গো মেষ মহিষ অশ্ব ও উষ্ট্র প্রভৃতি পশু, ব্রীহি যব প্রভৃতি শস্য, ইঁহাদের উৎকৃষ্ট ধনের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কুত্রাপি তাল প্রমাণ স্বর্ণের অধিকারিত্বও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত উহার সদ্ব্যবহার হইতে পায় নাই।

প্রাচীন রাজারা কোন শাসনবিধি প্রণয়ন করেন নাই, ধর্ম্মাধিকরণও সংস্থাপন করেন নাই, সাধারণের জ্ঞান-শিক্ষাতেও মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। তথাপি সেই সকল সমরকুশল বীরপুরুষ দিগের নিকট, হিন্দুজাতি অশেষ প্রকারে ঋণী আছেন।

ভারতে ঋষিরাই বিধিপ্রণেতা, বিচারকর্ত্তা ও শান্তি-বিধাতা; জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারের ভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। আবার আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সেই সময়ের কতিপয় ঋষি যুদ্ধ-বিদ্যাতেও পারদর্শী ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ঋষিরাই ভারতের রাজা ছিলেন। তাঁহা-দের চিন্তা স্বাধীন, বিচার নিরপেক্ষ, কামনা নিঃস্পৃহ, চরিত্র নির্ম্মল, এবং চেষ্টা সর্ব্বথা স্বার্থশূন্য বলিয়া প্রবাদ আছে। সকলে ঐশ্বর্য্য ভোগ করুক, তাঁহাদের বনবাসে আপত্তি নাই; সকলে শান্তিসুখ অনুভব করুক, তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশদানে আলস্য নাই; সকলে দীর্ঘজীবী হউক, তাঁহাদের তপস্যায়

দেহপাত করিতে ক্ষোভ নাই। এমন ঋষিদিগের নিকট কোন্ রাজার উপাখ্যান শোভা পাইতে পারে!

নারদ।

অজ্ঞাত ও অপরিচিত দেশে গমন করিয়া, সেই স্থানে সহসা কোন পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুর দর্শন পাইলে, আমাদের যাদৃশ আনন্দ হয়, দুর্গম বেদাদিগ্রন্থে অশ্রুতপূর্ব্ব নামসকলের মধ্যে, নারদের নামটী দেখিলেও আমাদের তাদৃশ প্রীতি জন্মে।

বিস্তীর্ণ ভারতভুবনে মহাত্মা নারদের নাম কে না অবগত আছে? এমন কয়টী প্রসঙ্গ আছে, যাহাতে মহর্ষি নারদকে বীণা-যন্ত্রসহকারে উপস্থিত হইতে না হয়? নারদ হরি-ভক্ত তাপস, পরম অমায়িক, ও নিরন্তর হরি-গুণ-গানে মত্ত।

ইহা কি সকলই অমূলক? বহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশে সুপ্রসিদ্ধ কণ্বগোত্রে মহাত্মা নারদের জন্ম হয়। আমরা তাঁহাকে ঐ গোত্রীয় পর্ব্বত নামক ঋষির সহিত যজ্ঞভবনে দেখিতে পাই। নারদ অতিশয় সঙ্গীত-প্রিয়; মন্ত্রের পরিবর্ত্তে সঙ্গীতের দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিতে ভাল বাসেন। যে তাঁহার যজ্ঞভবনে উপস্থিত হয়, তাহাকেই, এমন কি অধম শত্রুকেও তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ করেন; তাহাদিগকে বলেন, "বন্ধুগণ! আমার চক্ষুঃপার্শ্বে উপবেশন কর, এস সকলে সোমকে সম্বোধন করিয়া, সুচারুরূপে গান করি।"

যে সময়ে নারদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পুরোহিতবংশীয়ের সর্ব্বসাধারণকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিবার রীতি ছিলনা। তখন মন্ত্রত্যাগে সঙ্গীত সাধনার প্রথাও বিদ্যমান ছিলনা। তখন আর কোন যজ্ঞভবনেরও, উপাসনাত্মক মধুর সঙ্গীতে, আমোদিত থাকিবার নিদর্শন নাই। আমাদের বোধ হয়, নারদই সঙ্গীতসাধনার প্রবর্ত্তক। যে মধুর সামগানে ভারতীয় অরণ্যসকল শত সহস্র বৎসর নিনাদিত হইয়াছে, যে হৃদয়োন্মাদক ধর্ম্ম-সঙ্গীতে আজি পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দু কুটীর আমোদিত হইতেছে, বোধ হয় মহাত্মা নারদই তাহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

সমস্ত ঋগ্বেদ শাস্ত্রে দুইটী মাত্র সূক্ত নারদের। তাহা হইতে জ্ঞাতব্য অংশ আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। আর কোন্ গ্রন্থে নারদের জীবনী আছে তাহাও জানিনা। অথবা অন্য জীবনীর প্রয়োজন নাই। প্রসঙ্গমাত্রেই যে নারদ বীণা-যন্ত্রসহকারে হরি-গুণ-গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, উহাই নারদের জীবনী; হিন্দুরা ঐ ভাবেই নারদের কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

কশ্যপ।

মরীচিপুত্র কশ্যপ সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে বাস করিতেন। কুরুক্ষেত্রের নিম্নভাগে শর্য্যণাবৎ নামে এক সরোবর ছিল, তাহার তীরে অতি উত্তম সোম লতা জন্মিত।

কশ্যপ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই মহাত্মাই প্রথমে স্বর্গের আলোকময় ভাব জ্ঞাপন করেন। অতএব যাহা আলোকময় তাহাই স্বর্গ, এই রূপ চিন্তা করিয়াই কি তিনি সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া ছিলেন? তৎ প্রণীত সূক্তসমূহ হইতে উল্লিখিত প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দুষ্কর।

কশ্যপ সূর্য্যের উপাসক ছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারাই আর্য্য সমাজে সূর্য্যের উপাসনা প্রচারিত হয়। এই নিমিত্ত হিন্দু-সন্তানেরা সূর্য্যকে কাশ্যপেয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ করিবার অভিপ্রায় এই যে, সূর্য্য প্রথমে অজ্ঞাত ছিলেন, অর্থাৎ কেহই তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জানিতেন না, অনন্তর পিতা যেমন পুত্রকে প্রবর্ত্তিত করেন, কশ্যপও সূর্য্যকে সেইরূপ প্রবর্ত্তিত করিলেন।

অথবা ইহার অন্য অভিপ্রায় আছে। কশ্যপ ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, এক্ষণে কি প্রকারে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইতে পারে। কশ্যপের নামে কোন স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলে তাহা কিছু চিরকাল থাকিবে না; কশ্যপকে কোন উপাধি দান করিলে তাহাও কালে কালে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সূর্য্যকে কাশ্যপেয় বলিলে আর কোন আশঙ্কা নাই, যতদিন জগতে সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিন কশ্যপের কীর্ত্তিও অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। ইহাতে এক সময়ে যে কশ্যপের ধর্ম্মপ্রচার আর্য্য-সমাজের মহোপকার সাধন করিয়াছিল, এবং আর্য্যেরা ঐ উপকারের নিমিত্ত, অসামান্য প্রতি-দান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি। সংপ্রতি ইউরোপে, প্রতিভাপূজক মহাত্মাগণ, জ্যোতির্বিদ্যা-

বিশারদ হর্শেলের নাম, উপরোক্ত ভাবে, চিরস্থায়ী করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন।

বৃহস্পতি।

জ্ঞানবিষয়ে কখনই স্বাতন্ত্র্য শোভা পায় না। জ্ঞান পরাপেক্ষ বস্তু। জ্ঞানার্থীকে অনেকের নিকট যাইতে হয়, অনেকের উপাসনা করিতে হয়; অভিমানত্যাগ ও কঠোরতা স্বীকার না করিলে, কখনই তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হয় না। অপিচ যাঁহারা আপনি আপনি পণ্ডিত হইবার আশা করেন, তাঁহারাই চিরকাল মূর্খ থাকিয়া যান।

বৃহস্পতি ঋষি অশেষ কঠোর করিয়া যখন জ্ঞানার্জ্জন করিলেন, অন্যকে দানের প্রবৃত্তি তাঁহার মনোমধ্যে স্বতঃই উদিত হইল। তিনি তখন চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে সম্ভাষণ করিয়া, সেই মহাকাষ্ট-লব্ধ অমূল্য ধন অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

একজন উপদেশ দান করে, দশজনে তাহা শুনিয়া অনায়াসে জ্ঞানলাভ করে, বৃহস্পতির পূর্ব্বে, এই রীতি বিদ্যমান ছিলনা। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমান কষ্ট করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত। বৃহস্পতি, গুরুশিষ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া, জ্ঞানার্জ্জনের সহজ পন্থা প্রদর্শন করিলেন।

মহাত্মা বৃহস্পতি ভাষাসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দান করিতেন, এই গ্রন্থের 'ভাষা' প্রবন্ধে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত

হইয়াছে। তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন, অপিচ ভাষাকেই ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের হেতুভূত বলিয়া স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন, ভাষা না হইলে মনোবৃত্তি সকলের বিকাশ হয় না, কোন ভাবও ব্যক্ত করা যায় না ; মনের তৃপ্তি ও পবিত্রতা সংসাধিত হয় না। 'বুদ্ধিমান্‌গণ যজ্ঞের দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন,' এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, উপাসনাকালে, হৃদয়ের নিগূঢ়তম ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, তদ্রূপ বাক্য-যোজনার প্রয়োজন হয়, এবং তদ্দারাই ভাষার উৎকর্ষসাধন হইতে থাকে।

অনন্তর, ভাষা দ্বারা মন্ত্র হয়, মন্ত্র হইলে অর্থ হয়, অর্থ হইলে মনের তন্মুখী গতি হয়, এই প্রকারে মন ও ব্রহ্মের নৈকট্য-সাধন হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানময় মহর্ষি এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ সকল দান করিতেন। যাঁহারা শুনিতেন, বলা বাহুল্য, তাঁহারা আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্‌ মনে করিতেন, কেননা বৃহস্পতি না বলিয়া দিলে, এই সমস্ত কথার জন্য, তাঁহাদিগকে কয়েক জীবন কঠোর করিতে হইত, বলা যায় না।

এমন মহোপকারী ব্যক্তির জন্য, কৃতজ্ঞ আর্য্যজাতি কি করিয়াছেন? যে সময়ে ভারতে স্বল্পাক্ষরে বহুবিষয়ের যোজনা করিবার রীতি হইয়াছিল, সেই সূত্রযুগে আর্য্যেরা বৃহস্পতির সঙ্গে, দেবগুরু এই কথাটী উচ্চারণ করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র। আমরা দেখিতে পাই, এই কথাটীর মধ্যে, অসীম জ্ঞান, অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, এবং অসাধারণ অধ্যাপনাশক্তির ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে ; এবং যেহেতু এই উপাধি অন্য কোন

ঋষিকে প্রদত্ত হয় নাই, বৃহস্পতির অগ্রবর্ত্তিতা কে অস্বীকার করিবে ?

অগস্ত্য।

অগস্ত্য পঞ্চ জনপদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয়, অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশে তাঁহার নিবাস ছিল। নিদাঘ-তাপসন্তপ্ত অগস্ত্য, এক সময়ে প্রস্রবণ-লাভের জন্য অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন।

অগস্ত্য অত্রির পরবর্ত্তী ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, অত্রির সময়ে যমুনা-পর্য্যন্ত প্রদেশে আর্য্যদুন্দুভি নিনাদিত হয়। কিন্তু অগস্ত্য যমুনাতীরবাসী হইলে যমুনার নাম অন্ততঃ একবারও উচ্চারণ করিতেন। তিনি সিরানামক একটী ক্ষুদ্র স্রোতের কথা বলিয়াছেন। ঐ বুঝি তাঁহার স্বদেশীয় নদী, সরস্বতী ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রবাহিত ছিল!

দেবগুরু বৃহস্পতি যে গুরুশিষ্য ভাবের সৃষ্টি করিয়া যান, অগস্ত্যের হস্তেই তাহা সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ করে। আমরা দেখিতে পাই, অগস্ত্য শিষ্যদিগকে স্বগৃহে স্থান প্রদান করিয়াছেন। শিষ্যেরা গুরুকুলবাসী ও গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। অদ্যাপি বঙ্গ-পল্লীতে যেরূপ দৃষ্ট হয়, অধ্যাপকের ভার্য্যা লোপামুদ্রা, তাহাদিগের জন্য উৎকৃষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিতেছেন। জগতে এমন আর কয়টী প্রথার নাম

করা যাইতে পারে, যাহা চারিসহস্র বৎসর এক ও অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়াছে।

অগস্ত্য স্বর্গত বৃহস্পতির যেরূপ সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন, তাহাতে উভয়েরই মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "হে বৃহস্পতি! তুমি সূর্য্যের ন্যায় কিরণ প্রকাশে যত্নবান্ হইয়াছিলে, তুমিই সর্ব্বথা জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছ।"

অগস্ত্য যে কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেম, এমত নহে, বিজ্ঞান বিষয়েও তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ছিল। তিনি বায়ুতে মিশ্রিত এক প্রকার অদৃশ্য প্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। উহারা বিষাক্ত, এবং মনুষ্যকে লিপ্ত করিয়া মারাত্মক হয়। উহারা রাত্রিকালে পৃথিবীর নিকটে আইসে, ও সূর্য্যোদয় হইলে ক্রমশঃ দূরপসারিত হইতে থাকে। অগস্ত্য ঐ সকল কীটসম্বন্ধে আর অধিক কিছু অবগত ছিলেন, এমন বোধ হয় না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানই কি ঐ সকল বিষাক্ত কীটের অন্ত পাইয়াছেন?